তিতু মীর

মহাশ্বেতা দেবী

সবকাল প্রকাশনী
৮/২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলিকাতা-১৩

ইন্দ্রানী রায়

—স্মৃতিতে

॥ এক ॥

তিতুর মা রোকেয়া ঘরবার করছিল। বাপ মাঠ থেকে এসে ছেলেকে না দেখলে কত রাগ করবে, ঠিক নেই তার। ছেলেটাই কি কম পাজি নাকি। যেমন রোকেয়ার ছেলেটি, তেমনি ওর সঙ্গী-সাথী। ছেলে ভাতে হাত দিয়েছে, সঙ্গীরা দৌড়ে এসে বলল, আশ্চর্য কাণ্ড রে তিতু! বিশুদের গোহালের ঠিক পেছনে একটা বাঘের বাচ্চা—

—বাঘের বাচ্চা! নিশ্চয় বনবেড়াল হবে।

—আরে, চিতাবাঘের বাচ্চা। সেই যে মা ছিল আর ছুটো বাচ্চা। ওদের বাছুরটা নিয়েছিল, মনে নেই? সেই যে, যেটাকে চাচারা মারল। তারই বাচ্চা হবে। কেমন করে চলে এসেছিল কে জানে। এখন খড়গাদায় লুকাচ্ছে আর ফ্যাঁসফোঁস কবছে।

রোকেয়া বলল, তোদের কি খিদে লাগে না বাপ? এ খবর দিতে ছুটে এলি?

বারকিজুদ্দিন বা বিশু তিতুর এক অত্যন্ত অনুগত সৈনিক। সে বলল, কি যে বল চাচী! বাঘের বাচ্চা বলে আমরা কত দিন হাতিশপিতিশ করছি তার ঠিক আছে—

—বাঘের বাচ্চা নিয়ে কি করবি?

তিতু মায়ের অজ্ঞতায় হাসল একটু। বলল, বাঘের বাচ্চা থাকলে সুবিধে কত বল দিকি?

—আমি এমন কথা কখনো শুনিনি, বলব কোত্থেকে? লাঙলটা সারিয়ে আনলে তোর বাপের সুবিধে হয় তা তুমি কোন কাজে নেই। আমাকে জোলাঘর থেকে গামছা ছুটো এনে দিলে বাঁচি। কবে জোলাবউকে ধান দিয়ে রেখেছি। তা সংসারে বাঘের বাচ্চা থাকলে কোন্ সুবিধেটা হবে শুনি? এমন কথাও তো কোন কালে শুনিনি?

—এসো তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।

বলে এঁটো ভাত পাতে ফেলে তিতু হাওয়া। মাছ ধরেছিল আল্লেক করে, তাতে হাত দিল না, কাঁঠালবিচি পোড়া তেল লবণে মরিচে খেতে ভালবাসে তা পড়ে রইল, ছেলে বাঘের বাচ্চা ধরতে চলে গেল।

তিতুর ঠাকুমা কুচকুচ করে সুপুরি কাটছিল। সে বলল, অ তিতুর মা! ছেলে বাঘ আনতে গেল?

—দেখতে গেল।

—সে কি কথা? ও মা! বাঘের বাচ্চাও তো বাঘ! দেবে আঁচড়ে কামড়ে। তুই কি করে নিশ্চিন্ত আছিস মা? তোরও কি মনে ভয় ডর নেই?

রোকেয়া ঝেঁঝে উঠে বলল, আমি কি কানতে কানতে দৌড়ব? তোমার ছেলে এখন মাঠ হতে আসবে না? তেল রে, তামাক রে, ভাত রে! দেখ দেখি! মাঠে রোয়া চলছে। সে লোক মাঠে পড়ে আছে কিষেণদের নিয়ে। জোয়ান হচ্ছিস তুই। একটু বা গেলি। আমার খুব জ্বালা এই ছেলে নিয়ে।

—বাঘ আনবে কেন?

—সে বলছে বাঘ থাকলে সুবিধে।

বাঘ ধরে আনলে কিসের সুবিধে মা তা তো জানিনি! সঙ্গে জুটেছে কতকগুলো। ও মা!

তিতুর বাপ ঢুকে পড়েছে তা রোকেয়া দেখেনি। সর্বনাশ! বুঝি ছেলেকে সেদিনের মত পেটায়! নিসার সবই শুনে এসেছে। সে গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলল, কি গরম চেপেছে। ওঃ! আল্লা যামন আকাশ ফুঁড়ে জল দেয়, তবে বুঝি এট্টু ঠাণ্ডা হয়। মাঠে রইতে পারি না।

রোকেয়া পাখা একখানা রাখে দাওয়ায়। নিসার বলে, তিতুর কথা হচ্ছে? বাঘের বাচ্চা থাকলে সুবিধে কত তাই বলছে? ওরে পেলে আমি—আজ ওরে ভাত দিবি না।

রোকেয়া কিছুই বলল না। তেল এনে দিল। তামাক সেজে

আনল। তামাক খেতে খেতে নিসার বলল, জমিদার কি করবে তা জমিদার জানে। তবে ধানের চারা কি হয়েছে রে তিতুর মা! এই গছ, এই মোটা। যেন জমিদারের প্যায়দা। ওরা কোথায়?

—ওরা খেয়েছে।

—গেল কোথায়?

—নলু ওই তো খাঁচা বানাচ্ছে।

—কিসের খাঁচা?

—তিতু বলেছে তাতে বানাচ্ছে। মেয়েরা হাঁসগুলোকে ভাত দিতে গেছে। যাও, ডুব দিয়ে এস দিকিনি। ও সব যা হবে তা হবে।

গলা নামিয়ে রোকেয়া বলল, এই এমন চটা চটা কই মাছ। তিতু ধরেছিল।

স্বামী পুকুরে যেতেই রোকেয়া ছেলের ভাতের থালা সরিয়ে ফেলে। ছেলে খেতে খেতে উঠে গেছে দেখলে বাপ আবার রেগে উঠবে। বাপের রাগ অবশ্য যেমন ওঠে, তেমনই নামে। তবু রাগলে সে মানুষ অতি ভীষণ। সে কথা ছেলের মনে থাকে না।

স্নান করে আসে তিতুর বাপ। খেতে বসে। খেয়ে দেয়ে খানিক জিরোবে, আবার যাবে। রোকেয়ার সংসার শুনতে ছোট, আসলে ভারি। দুজন কিষাণ আছে। রাখাল ছেলেটা আর তার মা আছে। মন্নুর মা আছে বলে অবশ্য রোকেয়া বাঁচে। ধান সিজাও ভানো, পাক রসুই কর, হাস মুরগি এতগুলো, ঘর আছে, ছেলেমেয়ে আছে। মেয়ে দুটো বেশ ছোট। একটু বড় হলে খানিক সাহায্য হবে। তিতু কোথা গেল বল তো? মগরেবের নমাজের আগে ফিরলে হয়। দলিজের ঘরটি আজ নিকাতে হবে। পাঁচজন এলে এখানেই বসে।

বাপ মাঠে চলে যাবার পর তিতু অসম্ভব মলিন মুখে বাড়ি ফেরে। তার দুই চোখে জল ফেটে বেরোতে চায়।

—বাচ্চাটা পালাল মা। এই এত বড়। দুধে বাচ্চা নয়। বেশ বড়। এই এত বড়।

রোকেয়া হেসে ফেলে, সুবিধে হল না?

—কোথা আর হল ?

—কি সুবিধে রে বাঘের বাচ্চা থাকলে ?

—এই এত বড় খাঁচায় রেখে ওরে ছাগল মুরগি খাইয়ে বড় করতাম। তা বাদে হোই বাদুড়ে, হোই গোবরডাঙা, হোই বারাসত চলে যেতাম। বাঘ দেখালে পয়সা পেতাম। তা বাদে বাঘের সঙ্গে লড়তাম, সবাই দেখত। জানো, যে যত রুস্তম হয়, সে বাঘের সঙ্গে লড়ে। বাঘের সঙ্গে লড়লে মান খাতির কত !

—কি করবি, অত অত পয়সা দিয়ে ?

—কেন ? ঘোড়া চেপে গ্যাটম্যাট করে বেড়াব আর মাথার ওপর লাঠি ঘোরাব।

তিতুর দাদী দাওয়ায় বসে কান পেতে শুনছিল। সে বলল, হ্যাঁ রে! ফকির সন্ন্যাসীরা লাঠি নিয়ে যাচ্ছে আর গোরা সাহেব বন্দুক ফুটোচ্ছে। সে কি যুদ্ধ রে বাবা! এই তো সেদিনের কথা। এই আকাল গেল। যেতে না যেতে লেগে গেল যুদ্ধ।

রোকেয়া বলল, রাতদিন ওরে ও সব কথা বল কেন ? একে তো ও লাঠি রে, গুলতি রে—হ্যাঁ রে তিতু, তোরা না কি কুঠির দিকে গিছলি ?

—গিছলাম তো। কুঠির বাগান করবে সায়েবরা, তা কোথ্থেকে সব বুনোরা এসেছে কে জানে। কেমন হাসবে আর মেয়েরা বোঝা বইবে, আর তাদের ছোট ছেলেটা পর্যন্ত তীরধনুক নিয়ে বেড়ায় তা জানো ?

—না বাছা! আমার জানার আরো জিনিস আছে। আজ গামছা জোড়া এনে দিবি তিতু জোলাবাড়ি থেকে। বড় হচ্ছিস, কাজ খানিক করতে হয়।

তিতু খেয়ে উঠে গেল, তারপর রোকেয়া স্নানে গেল। কেউ বাদুড়ে যায় তো নির্ঘাত রোকেয়া ফকিরের কাছ থেকে মাদুলি আনিয়ে দেবে। ছেলেটা ওর পাগল একেবারে।

হায়দরপুরের লোকগুলোর কথা বলার নয়। সকাল থেকে রাত অবধি তিতুর নামে নালিশ শোন। তিতু দুর্ধর্ষ, তিতু দুর্দান্ত, তিতু

আর তার সঙ্গীরা সর্বদা দস্যিপনা করে বেড়াচ্ছে।

আবার ঠেলায় পড়লে ওই দস্যিকে নইলে চলে না। জোলা-পাড়ায় আগুন লাগলে বড়দের আগে ওরা দৌড়েছিল। তাজুদ্দীনের দেড় বছরের মেয়েটা জলে ডুবছিল। মেয়ে তলিয়ে যায় দেখে মা যত কাঁদে, পিসি তত কাঁদে। তিতু জামরুল গাছের ডাল থেকে ঝাঁপ দিয়ে সে মেয়ে তুলেছিল।

নালিশ যখন কর, এ সব কথা মনে থাকে না কারো? রোকেয়ার খুব বিশ্বাস, তার ছেলে হবে ধনী মানী গেরস্ত। গোহালে থাকবে এত এত গরু, ধানের গোলা থাকবে অনেক। তার দলিজে এসে বসবে হজ প্রত্যাগত মানী মানুষরা। ফকির দরবেশ দান খয়রাত পাবে, দীন দুঃখী পাবে ভাত। মানী মানুষ যেমন হয়।

তার তিতুর শাদী হবে। বরিয়াতে কত লোক যাবে। দোলার বিবি কে হবে? আর শাদী হলে তো তারও বেটা আওলাদ হবে। তখন আজান পড়বে। ছয়দিনের দিন মোরগ জবাই হবে। চিরকাল রোকেয়া শুনে আসছে যে ওই রাতে স্বয়ং আল্লা ছেলের কপালে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি যা হবে সব লিখে রেখে যান। মেয়েরা এমন বলে থাকেন। ছেলের শিয়রে মাটির দোয়াতে হীরেকষের কালি আর খাগের কলম রাখতে হয়। তিতুর বেলাও রাখা হয়েছিল। রোকেয়া জানে না তার বড় ছেলের কপালে কি লেখা হয়েছিল। কোন মা জানতে পারে না এ কথা। আফিকা হয়েছিল তিতুর। তার বেটারও হবে। রোকেয়া নিশ্চয় সব দেখে যাবে। নিশ্চয় তার আগে ইন্তেকাল করবে না।

সাঁতার দিয়ে রোকেয়া চারটি হেলঞ্চশাক তুলে আনল। ওর শাশুড়ি খেতে ভালবাসে।

গ্রামে এত ছেলে আছে, তিতুর মত রাঙা চেহারা কারো নেই। হবে না কেন? তিতুর বাবা কি কম দলমলে পুরুষমানুষ, না রোকেয়া কম সুন্দরী? এখনো তো তার রং পাকা কাঁঠালের মত। কে বলবে চার ছেলেমেয়ের মা।

॥ দুই ॥

রোকেয়া কম চেষ্টা করেনি। ছেলে কিন্তু তার শান্ত ছেলে লক্ষ্মী ছেলে হল না। হায়দারপুর ছোট্ট গ্রাম। ছোট্ট গ্রামের এই ছেলেটি তাজুদ্দীনের কাছে লাঠির আখড়ায় ভিড়ল। লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া, চাষবাসে মন নেই ওর। বাবা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, তা চাষকাজে যে থাকতেই হবে, তার কিছু মানে নেই। ভাল লেঠেল হলে জমিদারের কাছেও ভাত আছে, নীলকুঠিতেও ভাত আছে।

তিতু জন্মাবার আগেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়ে গেছে। তখন চাষাবাদ হয়নি, পোকপতংয়ের মত মানুষ মরেছে। সাহেবরা যত ধানচাল কিনে গোলাজাত করেছিল। কিনল সস্তায় আর বেচবার কালে চাল হয়ে গেল সোনার মত মাগ্যি। তাতেই তো এত মানুষ মরল।

তিতু শুনেছে, তখন পথে পথে কঙ্কালের মিছিল চলছিল। গাছ-পাতা, শেকড়-বাকল, কিছু খেতে বাকি রাখেনি মানুষ। তেমনি কি ডাকাতের ভয় হল। ডাকাতরা বলত, সোনাদানা চাই না, ভাত দাও, চাল দাও।

এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মরেছিল। তবু তো বড়লাট খাজনা ছাড়েনি। ১৭৭০ সালে মন্বন্তর। ১৭৭১ সালে খাজনা উঠল আরো বেশি। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস একদিকে এশিয়াটিক সোসাইটি করার কথা ভেবেছেন, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন, হিন্দু আইনের ওপর প্রবন্ধ লিখিয়েছেন, আইন-ই-আকবরীর ইংরেজি তরজমা করিয়েছেন।

অন্যদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খুঁটি শক্ত করাই তো ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলা যখন শ্মশান, হেস্টিংস প্রবল চাপ দিয়ে আরো বেশি খাজনা তুললেন।

এর অনেক আগেই, এর সাত বছর আগেই, ইংরেজ কুঠিয়ালদের ঢাকা কুঠি আক্রমণ করে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' নাম হলেও সে তো ফকির বৈরাগী সাধু-সন্ন্যাসী-তাঁতী-চাষী কামার-কুমোর সকলেই বিদ্রোহ, আর তা চলেছিল আঠারো বছর ধরে।

তিতু এ সব কথার কিছুই জানত না। পুঁড়ায় চলে যেত তিতু, চলে যেত গোবরডাঙা। পালোয়ানদের সঙ্গে লড়ত, লাঠির খেলা দেখাত।

তেমনি করে বাদুড়েতে এক জমজমাট হাটবারে, খেলা দেখিয়ে অনেক নারকোল ও নতুন গামছা জিতে তিতু আর তার বন্ধুরা যখন ঘুষি মেরে ফাটিয়ে ডাব খাচ্ছে আর হা হা করে হাসছে, তখন হঠাৎ শোনে ঢেঁড়া পড়ছে।

থানার বরকন্দাজ আর জমিদারের পাইক ঢেঁড়া দিচ্ছে, কি বলছে। শোন শোন সর্বজন, মন দিয়ে শোন। মহামান্য বড়লাটের আদেশ এই, যে সন্ন্যাসী-ফকির, এদের একেবারে পরাজিত করা গেছে। সোভান আলি, নেয়াজ্ শাহ, বুদ্ধ শাহ, কি তাদের কোন অনুচরকে অথবা অনুচরদের ধরে দিলে পুরস্কার, আশ্রয় দিলে শাস্তি।

—এরা কারা?

—তুমি কে?

—আমি হায়দারপুরের তিতু মীর।

—চেহারাখানা তো জবর বাগিয়েছ ভাই। এরা সব ডাকাত-টাকাত আর কি! ধরলে বখশিস, আশ্রয় দিলে শাস্তি,—ধুর শালা! কোথায় কি বকছি? এখানে তারা কোথায়? কোথা না কোথা লড়াই হয়েছে, কোম্পানীর হুকুম যেমন!

—যাক গে! আজ লাউ আর মাছ নিয়ে না ফিরলে বাড়িতে রক্ষে নেই।

এ কথা বলে পাইক ও বরবন্দাজ টপাটপ হাটুরেদের ঝুড়ি থেকে তুলতে থাকে ফল, সব্জী, মাছ। মাছবিক্রেতা হাত-পা ধরে, মাছটা বেচব এক আনায়, চাল-তেল কিনে ফিরব। ওটা নিও না গো।

বরকন্দাজ কথাটা মোটেই শোনে না।

লোকটি কেঁদে ফেলে।

তিতু মীর কিছুই না ভেবে বরকন্দাজের হাত থেকে মাছটি নিয়ে নেয়।

—এর মানে?

—ছোট মাছও তো একটা নিতে পারো।

—ছি ছি ছি! ছুঁয়ে দিলি? এ মাছ আর নেবে দারোগাবাবু?

—সেও তো বটে। ছুঁয়েও তো দিলাম।

—হাফিজ হঠাৎ বলে, ওঠে, ও বরকন্দাজ দাদা! মাছ যখন ছুঁলো, তখন তোমার হাতে ফল তরকারিও তো ছিল। সবই যে ছোঁয়া-নেপা হল।

বরকন্দাজটি ঝাড়ু উপুড় করে ঢেলে দেয়। তিতু বোঝে যে ব্যাপারটি খুবই গোলমেলে হল। সে বলে, চিরকাল তোলা নিচ্ছ, নাও। একটু রয়ে সয়ে নেবে তো? মানুষের সেরা জিনিসটা নিলে সে কি খায়?

—এর শাস্তি তুই পাবি।

—আরে! আমি ভূদেব পালচৌধুরীর লেঠেল। আমাকে শাস্তি দেওয়া কি এতই সোজা?

—অ্যাঁ? বারোগাছিয়ার ভূদেববাবু? যার সিংদরজায় হাতি বাঁধা থাকে?

—আর কে আছে ও নামে?

—তাই বল, তাই বল।

ওরা চলে গেলে হাটুরেরা খুব খুশি। ওঃ, আজ তো খুব বাঁচালে ভাই। এমন বাঁচান বাঁচব এ তো কখনো ভাবিনি। জমিদারের পাইক নেবে, বরকন্দাজ নেবে, এত দেওয়া যায়? সেদিন কাঁঠাল নিল দশটা, আবার বয়ে দিয়ে আসতে হল।

ঘরে ফেরার সময়ে হাফিজ বলল, কবে তুই যেয়ে জমিদারের লেঠেল হলি?

—আহা! হব তো! মুখে যা এলো তাই বললাম। ভূদেব

পালচৌধুরী একশো লেঠেল-বর্শেল রাখে। তার রবরবাটাও বেশি। সেখানে যেতে হচ্ছে একবার। এমন জীবন আর ভাল লাগছে না।

—তুমি যাবে, আমরা কি বসে থাকব? আমরাও তোমার সঙ্গ ধরব।

—দেখা যাক। তাজুদ্দীন চাচা এসে পড়লে সব হবে। সে বললে সবার কাজ হবে। বাপরে! লাঠি হাতে ধরল তো সেজনা বাঘ!

—এখন তোর শাদী হবে।

—তাতে কি?

—চাচী যেতে দেবে না।

—তা বললে হয়? কিন্তু ফকির-সন্নেসীরা এতদিন লড়াই করেছিল তা তো জানি নি।

—একটাকে পেলে ধরাবি?

—দূর দূর! ও ধর্ম কাজ হয় না। ও সব কথা থাকুক গে। চল দেখি একবার শিকারে যাই। বিলে পাখি বিস্তর, আর ডাহুকের মাংস অনেক দিন খাইনি। নৌকো নিয়ে ওপারে যাব আর পাখি মারব।

ফেরার সময়ে তিতু ছুতোর বাড়ি থেকে গরুর গাড়ির চাকাটা নিল, সারতে দিয়েছিল।

শাদীর কথাটা সত্যিই হয়েছিল। মেয়ের বাড়ি খালপুর গ্রামে। মেয়ের নাম মায়মুনা খাতুন সিদ্দিকা। দোলার বিবি যাবে নিসারের চাচী, বরিয়াত যাবে অনেকে, সে সব কথা হচ্ছে সব সময়ে। যা যা বুশুন সবই করতে হবে। মৌলভি খোত্‌বা পড়াবেন, মোনাজাত করবেন। তিতুর বক্তব্য, খাঞ্চায় যখন তাকে আর পাঁচজনকে খেতে দেবে সে তো একাই এত এত খেয়ে নেবে।

তিতুর বয়স তো বছর কুড়ি হল। পাহাড়ের মত শরীর, এই ফর্সা রং, উজ্জ্বল চোখ, পাঁচজনের মধ্যে চেয়ে দেখতে হয়। রোকেয়ার এক কথা, ছেলের শাদী হোক, সংসার কি বস্তু তা বুঝুক। তবে তার দায়িত্ববোধ হবে, সংসারে মন হবে। শাশুড়ি তো মরে গেল। সে বেচারার নাতবৌ দেখা হল না।

নিসার বলেছিল, ও ছেলে সংসারী হবে না। ও অন্য কোন কাজ করবে।

—অন্য কাজ? কি কাজ? জমি-জেরাত, হাল-বলদ, হাঁস-মুরগি এ সব নিয়েই তো কাজ। রোকেয়া বলেছিল, চাল ছাইতে হবে। আরেকটা ঘরও তোল।

—সব করব। তবে ছেলে সংসারী হবে না। গায়ের পিরান যে পরকে খুলে দেয় সে ছেলে সংসারী নয়!

নলু সে কথা শুনে হেসেছিল। আব্বাজান কিছুই চেনে না বড় ছেলেকে। পিরাণ কাপড় এ সব কি তার প্রিয় জিনিস? ধনুক, লাঠি, এগুলো ওর প্রিয়। নাও দেখি লাঠিখানা? তখন সে নাচতে শুরু করবে।

তিতুরা শিকারে গিয়েছিল। হায়দারপুর থেকে দূরে বিলের ধারে। বিলের ও পারে একটি পাকা ঘর। জমিদাররা যদি কখনো মাছ ধরতে আসে, ও ঘরে বসে, খাওয়া-দাওয়া হয়। ওই ঘরে তিতু ও তার সঙ্গীরা কতবার শিকারের পাখি রেঁধেছে, খেয়েছে।

নৌকো নিয়ে বিলের ওপারে গিয়েছিল ওরা, কয়েকটি পাখি তারে বিঁধে ফেলা গেছে। শাদী হলে নাকি জীবনটা পালটে যায়। তা, এখন তো খানিক আনন্দ করা যাক।

এখন বিলের জল পাড় ছাপিয়ে ওপরে। ঘরটির গায়ে নৌকো ঠেকিয়ে ওরা নেমেছিল, আর তারপরেই চমকে উঠেছিল।

ঘরে একটি লোক শুয়ে ছিল। পোশাক ফকিরের মত, কপালে একটি ক্ষতচিহ্ন তখনো দগদগে, পাশে একটি খোলা, ছোট তলোয়ার।

চোখ খোলার আগে লোকটি তলোয়ারের মুঠ চেপে ধরেছিল। তারপর বলেছিল, তোমরা কে?

আমরা—আমরা এই কাছাকাছি গ্রামের ছেলে। আমরা আনন্দ করতে এসেছি খানিক।

লোকটি উঠে বসেছিল। তারপর হাই তুলে বলেছিল, ভাল, ভাল। তা খাওয়া-দাওয়া করবে নাকি?

—হ্যাঁ, শিকার করেছিলাম—

—ভাল। আমার খুব খিদে পেয়েছে।

—আপনি কে ?

—মিস্কিন শাহ, মুসারৎ শাহ, নানা জায়গায় নানা নাম আম্মার।

—"শাহ"! তবে—তবে··· ?

—হ্যাঁ। ধরিয়ে দিলেই পুরস্কার।

তিতু ওর বন্ধুদের দিকে চাইল। তারপর বলল, যে কোন কসম খেতে বলেন খাব, কিন্তু আপনাকে ধরিয়ে দিয়ে আমরা কোন বখশিস চাই না। আমরা গ্রামের ছেলে, আপনার মতই মুসলমান। অধর্ম জানি না।

ধর্ম কি, তা জানো ? এ সব বড় কঠিন কথা হে। শিকার কি করেছ, তা রাঁধলে হত না ? দু'দিন খাইনি।

যতক্ষণ পাখির মাংস রান্না হচ্ছিল, লোকটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিল। এখানে আসার এবং যাওয়ার পথ কি রকম। এসেছে তো রাতে রাতে। দিনে মানে লুকিয়ে থেকেছে জঙ্গলে। এপাশে ওপাশে গ্রাম। জমিদার কে ?

তিতু ও তার সঙ্গীরা লোকটিকে তৃপ্তি করে খাওয়াল। তিতু বলল, আপনি এখানে থাকুন না কেন ? আমি আপনাকে খাবার পৌঁছে দিয়ে যাব।

—অত এগিয়ে ভাবতে পারি না।

তিতু খুব অবাক হচ্ছিল আর আশ্চর্য একটা আকর্ষণ বোধ করছিল। এই লোকটির মাথার ওপর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে কেন ? এ কি করেছে ?

—কি করেছেন আপনি ?

—সব কি আর বলা যাবে ভাই ? তোমরা এখন যাও। কাল কিছু খাবার দিয়ে যাবে সকালে ?

—নিশ্চয়।

নৌকো বাইতে বাইতে ওরা ঠিক করল, কাল খুব ভোর রাতে চলে আসতে হবে। আর কার্যকারণ যা-ই হোক, লোকটির অস্তিত্বের

কথা কাউকেই বলা চলবে না। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছে, কথা দেওয়া হয়েছে, এখন কথা ভাঙলে পরে দোজখ—নরকে যেতে হবে।

বিশু বলল, কাঁথা একখানা আনতে হবে। মাটিতে শুয়ে আছে।

তিতু বলল, কেমন খপ করে তলোয়ারটা ধরল তা দেখেছিলি?

পরদিন খুব ভোরে ওরা চলে এলো। একটা পাতিল, চিড়ে, গুড়, পাকা কলা, একটা কাঁথা নিয়ে।

লোকটি বলল, নাঃ! ছেলে তোমরা সত্যিই ভাল।

—আপনার পায়ে এগুলো কিসের দাগ?

—গুলির।

—কবে লেগেছিল?

—এটা তো ইংরিজী ১৮০১ সাল। তা, বছর পনেরো আগে!

তিতু বলল, কেমন করে?

লোকটি হাসল। বলল, কেন, যুদ্ধ করে—

—আপনারা যুদ্ধ করেছিলেন?

—নিশ্চয়।

—হাটে বলছিল, আপনারা ডাকাত!

—বললে আর কি করা যাবে বল।

—আপনি ফকির তো?

—নিশ্চয়। তখন ফকিররাও লড়ছে, সন্নেসীরাও লড়ছে। তারপর বছর কুড়ি আগে মজনু শাহ আবার যখন এলেন, তখনই আমরা একজোট হলাম।

—কোথায় যুদ্ধ হল?

—সে কি এক জায়গায়?

—কার সঙ্গে যুদ্ধ?

—জমিদার, কোম্পানী—সরকার!

—কেন যুদ্ধ হল?

লোকটি তিতুর প্রজ্বলিত মুখের দিকে চাইল। বলল, যুদ্ধের কথা খুব ভাল লাগে?

—খুব।

—এত অত্যাচার, এত দুঃখ কষ্ট! সব তো জমিদার আর কোম্পানী সরকারের জন্যেই। তাতেই যুদ্ধ হয়েছিল, এ কি সোজা কথা?

—হাটে বলে দিল, ওরা ডাকাত।

—ওদের চোখে তো ডাকাতই।

—যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেল?

—বড্ড দুঃখ হচ্ছে? না না, ওসব কথা ভেব না। তোমরা গ্রামের ছেলে, চাষবাস দেখবে, যুদ্ধ নিয়ে ভেব না। আর শোন, কাল আর এসো না।

—কেন?

—আমি রাতে চলে যাব।

—কোথায়?

—উত্তর-পূবে তো হাঁটি। যশোরে ঢুকে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত। সেখানে আমাদের লোকজন বেশ কিছু ঢুকেছে।

—কোথায়?

—আগে তো যাই। তারপর তাদের সেখানে না পাই, দক্ষিণে নেমে যাব।

—সেদিকে তো জঙ্গল, সুন্দরবন।'

—আরে কত ভাঙা কুঠি, গড়, মন্দির সেখানে। সে অসাগর বনে কে ঢুকবে? গরাণ আর সুঁদরিগাছ, গুলো আর হেঁতাল, বাঘ আর সাপ!

তিতু বলল, আমি আসব আর আপনাকে পার করে দেব। খানিক পথ চলে তারপর হাটিংগায় যমুনার পারঘাটে যমুনা পার করে দিয়ে আসব। তারপর যেতে পারবেন।

সন্ধেবেলা তিতু দেলকো নিয়ে এলো। আলো ছাড়া কি পথ চলা যায়? লাঠি নিল তার। হাতে লাঠি আছে তো তিতু কারুকে ভয় করেনা। ফকিরের সঙ্গে চলতে চলতে বলল, আপনাদের যুদ্ধের কথা বলুন।

ফকির কথা বলতে বলতে পথ চলল। এরা বলেছিল, 'দীন! দীন!' আর সন্নেসীরা বলেছিল, 'হর! হর!' বলতে বলতে এরা কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছিল? এমন আশ্চর্য কথা তো তিতু ভাবতেই পারে না। তিতুর তরুণ রক্তে নেশা লেগে যাচ্ছিল শুনতে শুনতে। এই অভিজ্ঞতাটির কথা তিতু সারাজীবন মনে রেখেছিল। গৃহস্থ চাষীর ছেলে তিতু যখন তিতু মীর হয়, তখন তাকে তৈরি করার মূলে এই রাতটির অজানা অবদানও থাকে।

গ্রামগুলি ঘুমে অচেতন। বৃষ্টি ধোয়া আকাশে তারা ঝকঝক করে। তিতু ও ফকির পথ চলে। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের এক পলাতক বিদ্রোহী। তিতু হায়দারপুরের এক সম্পন্ন চাষীর ছেলে। চলতে চলতে তিতু বোঝে কোন দিন বাবার মত ধান রোয়া থেকে ধান কাটার যে অনুবর্তন, তার মধ্যে বাঁধা থাকতে পারবে না। ফুলের সেহেরায় মুখ ঢেকে শাদী করতে যাবে। সবই করবে, শুধু বাবার মত ধান-চাল হাঁস-মুরগি বউ-ছেলে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারবে না।

॥ তিন ॥

ফকির কোন দিন ভাবেনি যে তার সঙ্গে তিতুর আবার দেখা হবে। তিতুও ভেবেছিল ফকির তার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। ফকির প্রথমে গিয়েছিল নলগোলা। সেখানে সে ফকিরের পোশাকেই ঢুকেছিল। তারপর গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করতে করতে, গৃহস্থদের জন্য আল্লার দোয়া চাইতে চাইতে সে দক্ষিণ দিকে চলে যায়। সুন্দরবনের প্রান্তে এক ছোট গ্রামে বসবাস শুরু করে। ফকির, মিশকিন, এতিম—এখনো গ্রামে এদের সম্মান খুব বেশি। ওষুধ-বাকল দিয়ে সে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করে। তারপর মাউলি ও জেলেদের সঙ্গে বলে যাওয়া, সুঁড়ি নদী ও খালে ভেসে বেড়ানো শুরু করে। বাঘ, কুমীর, সাপ ও ডাকাতের উপদ্রব যাদের চিরসঙ্গী তারা ওকে পেয়ে খুব খুশি হয়। ফকিরও নিশ্চিন্ত হয়। বয়স তো বছর চল্লিশ হল। আর যুদ্ধ-টুদ্ধ হবে বলে মনে হয় না। তবু এ জীবন এক রকম। এই দূরদর্গম থেকে কোম্পানী সরকার ও তার হম্বিতম্বি খুবই অলীক মনে হয়। হরিণবাড়ির গারদে আটকা থাকতে হল না, এই অনেক।

আর তিতু খুব আটকে পড়ে সংসারে। কলকাতা থেকে হায়দারপুর নিশ্চয় অনেক দূরে নয়। তবু তা অনেক দূরেই থেকে যায়। তিতুর শাদীর অনেক আগেই প্রবর্তিত হয় কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত, আর খুব তাড়াতাড়ি কর্ণওয়ালিশ যা চেয়েছিল তার হয়। কোম্পানীর হুকুমে 'আকাশ সবুজ' 'পূর্ণিমা তিথিতে অমাবস্যা' এমন কথাতেও 'হ্যাঁ হুজুর' বলবে, এমন এক বশংবদ জমিদারের দল তৈরি হয়। সরকারকে তারা দশ টাকা দেয়, প্রজার কাছে তোলে বিশ টাকা, আর এর চাপ হায়দারপুরেও এসে পোঁছয়।

তিতুর তিনটি ছেলে হয় একে একে। জওহর, তোরাব ও গওহর। তিতু বলে, আব্বাজান! শুধু ধান নিয়ে পড়ে থাকলে আর চলবে না। জমিদার সরকারকে দিচ্ছে বাঁধা টাকা। আমাদের বেলা তার পালপরবের খরচা, পুণ্যর খরচা, তিনি কবে কি উটকো আবদার করবে তার খরচা—এ যে দোকর জুলুম হয়ে যাচ্ছে।

—দেখ্ কি করতে পারিস।

রাকেয়া বলে, মারদাংগা করতে পারে।

তিতু বলে, তাজুদ্দীন চাচা কোন সাহায্য করতে পারে। সে তো বড় জমিদারের বাঁধা লেঠেল।

মা বলে, লেঠেলের কাজ করবি বাছা? হাট গোমস্তাকে ধান দিয়ে তোকে বাংলা শেখালাম, মৌলবি সায়েবের কাছে খানিক আরবি শিখলি, তা জমিদারের কাছারিতে কাজ হয় না কিছু?

—কি কাজ দেবে সে? তার বরকন্দাজদের সঙ্গে আমার ফি হাটবারে ঝগড়া হয় না? তারা তোলা তুলবেই, তুলবে খাবল মেরে, তারপর আসবে নীলকুঠির পেয়াদা, আর থানা সেপাই তো আছেই। আমি তাই নিয়ে ফি হাটবারে লড়ব। আমাকে সে কাজ দেয়?

—লেঠেলের কাজ করলে তো নীলকুঠির গোমস্তা হরবখত ডাকছে তোকে।

—নাঃ! নীলকুঠিতে লেঠেল হব, আর চাষীর গলায় পা দেব, সে কাজ করব না।

জমিদারের গোমস্তা কিন্তু তিতুকে নজর করছিল। জমিদার তাকে বলেছিল, যে হাটতোলা নিয়ে লড়ে যায়. সে লোকের সাহস আছে বলতে হবে।

—হুজুর, শক্তিও বিস্তর। দেখলে মনে হবে বুঝি কোন সাহেব আসছে। দেহের বর্ণ, আর চোখ যেন জ্বলে।

—লেঠেল কেমন?

—লেঠেল, বর্শেল, তীরন্দাজ অমন কেউ নেই।

—সবাই মানে গণে?

—বিস্তর।

—তা এমন লোককে মাইনে দিয়ে আমার লেঠেল সর্দার করতে পারছ না? নীলকুঠি সায়েবদের ভয়, ডাকাতের ভয়, হাজারটা ভয় তো তোমার যায় না।

—দেখি, বলে দেখব।

গোমস্তা বলেছিল, দেখ নিসার, তোমার ছেলে যদি হুজুরের পা ধরে বলে, তাহলে গোবিন্দপুরের কাছারিতে ওর কাজ হয়ে যায়।

নিসার স্বগ্রামে সম্মানিত লোক। তার ছেলে তিতু গিয়ে পা ধরে বলুক, এমন কথাটা গোমস্তা বলে ভুল করল। নিসার বলল, দেখি।

—তাঁর দয়াতেই তো খাচ্ছ পরছ।

নিসার চুপ করে থাকল। তারপর বলল, আমার কথায় তো হবে না আজকালকার ছেলে কি বাপের কথা মানে? আপনি কত কথাই বলে গেলেন, আমি মেনে গেলাম। এরা কি তা মানে? দিনকাল খুব মন্দ হয়ে পড়েছে।

—তাই তো দেখছি, আর তোমার কথাতেও তাই মনে হচ্ছে। অথচ কথাটা স্বয়ং হুজুরের কথা।

—আপনারা তেলে মাছে থাকেন। আমরা সকল ভাবে ফাঁদে পড়েছি। এক পয়সায় এক পালি চাল হচ্ছে না আর, সেই জ্বালাতে মরে যাই। যাক, ঘরে যদি পাই তো বলব।

—যায় কোথা? যেমন ভীমকান্তি চেহারা, ডাকাতি করতে যায় না তো?

—আমি তো জানি তাকে ডেকে নিয়ে যায়, সে লাঠি খেলে, কুস্তি লড়ে, ইনাম পায়। তবে আমার কথাটা কি গ্রাহ্য করলেন? খোঁজ নিয়ে দেখুন।

ঘরে এসে নিসার ছেলেকে বলেছিল। যেখানে হয় কাজ নিয়ে যা। গোমস্তার কথাবার্তা খুব পেঁচালো। পায়ে পা দিয়ে কেজে বাধাতে চায়। যা, তাজুদ্দীনের কাছে যা।

অপুত্রক তাজুদ্দীন তার লেঠের সর্দারের পদের জন্যে উত্তরাধিকারী পাচ্ছিল না। জমিদারের এক কথা—আমি তোমাকে জানি,

আর কাউকে জানি না। তুমি তোমারই মত বিশ্বাসী কাউকে দিয়ে যাও।

—আছে যে সে তো সাঁচাই হীরে হুজুর। অমন ছেলে চার দিগরে নেই। তার বাপ মানী সম্মানী লোক। জমি-জেরাত, হাল-বলদ, কোন অভাব নেই। ছেলের তেজদর্প খুব বেশি। নরম কথা বললে জান দেবে, আর অসম্মান করলে রুখে যাবে। লেখাপড়াও খানিক জানে। তবে সেরেস্তার কাজ তার পছন্দ নয়।

—অমনি ছেলেই তো চাই।

ভূদেব পালচৌধুরী নিশ্বাস ফেলল। বলল, আমাদের মত জমিদার তো কোম্পানী চায় না। উটকো লোক লাটের কিস্তি জমা দিলেই এখন জমিদার হচ্ছে। সে থাকছে কেষ্টনগর, টাকি, কলকাতা। আমলা গোমস্তা সব নয়ছয় করছে। এখন অমন জমিদারই লোকে চাইছে। সে উঁকি মেরে দেখবে না। দেশে পুকুর প্রতিষ্ঠা, দুটো গাছ পোঁতা, সব বন্ধ। টোল-পাঠশালা উঠে যাচ্ছে। তাতে গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া এই নীলকর সায়েবটা। প্রজাদের সর্বনাশ বই তো নয়।

—নীলকর হতে সর্বনাশ হবে।

—এখানে নীলকর আমাকে সর্বনাশ দেখছে। আমি এখানে মাটি কামড়ে পড়ে আছি তো। কোম্পানীর প্যাঁচ শাঁখের করাত। যেতে কাটে, আসতে কাটে। তুমি পুরাতন লোক, সবই জানো। আমার তো মনে হয় আমার নামে সালিয়ানা জমা না দিয়ে নিজের নামে বা বেনামে জমা দিয়ে বারোগাছিয়ার মালিক হবার জন্যে রামচাঁদ বসে আছে।

—আমি কি বলব? আপনি তো জানেন।

—সে আমাকে জপাচ্ছে, হুজুর। চরগোবিন্দপুরে প্রজারা নীল বুনতে খুব রাজী। অর্থাৎ আমি একবার 'হ্যাঁ' বলি। তাহলেই ও চরের জমি পত্তনি দিতে পারে আর প্রজার পাতে ছাই পড়ে।

—সে তো জানছি।

—নীলের গোমস্তা যে গুর বেয়াই!

—খুব জুলুমবাজ।

—এখনো তো নিজেরা স্বনামে নীলের জন্যে জমি লীজ নিতে পারে না।

—চাকর-কুলি-জলভারী, কার নামে-না বেনামী জমি নিচ্ছে।

—নিচ্ছে তো বটেই। তেঘরার কাশেম মল্লিক, রহিম মল্লিক দেখ চালে খড় নেই, অথচ তাদের নামেও জমি ইজেরা নিচ্ছে। এখনো তবু স্বনামে মালিকটা হতে পারছে না। কোম্পানীর সায়েবরা সেটুকু পর্দা কি রাখবে ?

—কি করবে ?

—নীলকরও সায়েব, কোম্পানীও সায়েবদের। কবে দেখ আইন করে ওদেরকে স্বনামে জমি নেবার হক দিয়ে দেয়। তা দিলেই সর্বনাশ ষোলকলা হবে।

—তা, রামচাঁদ গোমস্তাকে তো আপনিই ছাড়িয়ে দিতে পারেন। সে লোক কি দরের তা তো জানছেন।

—ওইটে যে পারি না। বাবাও কাউকে ছাড়ালেন না, আমিও পারি না। ব্রহ্মশাপ লেগে যাবে। তার বাড়ি ফি বছর দুর্গা উঠছেন দালানে।

তাজুদ্দীন বিরক্ত হয়ে বলল, মাসে বারো টাকা মাইনের নায়েব দোল দুর্গোৎসব করছে, চারশত টাকা খরচ করে দালান দিল, তা আপনি দেখেও দেখছেন না। জমি এখন বাপের নয়, দাপের। দিনকাল খুবই খারাপ পড়েছে।

—ও বাবা! আমি ঝগড়া বিবাদকে ভয় পাই। তাতেই তো তুমি যেতে চাচ্ছ জেনে থেকে ভয় হচ্ছে।

—আপনার এত তালুক মুলুক, দোলের দিনে হাতির পিঠে মদনমোহন বের করেন, তিনশো লেঠেল রাখেন পাঁচটা কাছারিতে, আপনার ভয় কিসের ?

তাজুদ্দীন এমন কথা বলতে পারে। কেন না সে নিজের দশ বিঘা জমি রাখে, লেঠেল সর্দার সে, হায়দারপুর ঘিরে দশটা গ্রামে সে বহু ছেলেকে লাঠিখেলা শিখিয়েছে এবং লেঠেল দলে এনেছে।

মাথাটি তার উঁচু। মিছে কথা বলে না। বেইমানি জানে না, আ
হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়ালে তার মুখোমুখি হবার সাহস কম জনে
রাখে।

তাজুদ্দীন তিতুকে খুঁজছিল আর তিতু খুঁজছিল তাজুদ্দীনকে
মাসে বিশ টাকা দরমাহায় তিতু নিযুক্ত হয়ে গেল। চরগোবিন্দ
পুরের ব্যাপারটি তাজুদ্দীন ওকে ভাল করে বোঝাল। তারপ
তিতুকে নিয়ে গেল সেখানে। পুরানো লেঠেলদের মুখ ভার হল
তারা এখন কথা মানবে ওই ছোট ছেলেটার ? খুব ছোট নয় তিতু
বয়স তার তিরিশ হবে।

তাজুদ্দীন তামাক ও সুপরি মুখে ফেলে বলল, তোমরা ওর সঙ্গে
দু'হাত খেলে দেখ। হারলে ও চলে যাবে না হয়।

—আর জিতলে ?

তিতু বলল, তোমরা যা বলবে তা হবে।

একজন বলল, হায়দারপুরের নিসার আলির তো দুধেমাছে
অবস্থা।

তিতু বলল, তেমন অবস্থা এখন কার থাকতে পারে ?

—জমিদারের গোমস্তা তা থাকতে দেয় ?

চরগোবিন্দপুরের চাষীরা ভীড় করে এলো। কাছারি
আঙিনায় লাঠিখেলা হল।

তিতুর লাঠিখেলা দেখে ওরা স্বীকার কবল যে তিতুর শ্রেষ্ঠত্বে
কোন সংশয় নেই। একই সঙ্গে তারা এ কথাও বলল যে এখ
তাদের সন্দেহ হচ্ছে। তাজুদ্দীন শ্রেষ্ঠ কায়দাগুলি তিতুকেই শিখি
য়েছে এবং তাদের এমন ভাঁওতায় রেখেছে, যে সকলের হাতের লাঠি
উড়ে গেল।

তাজুদ্দীন খুবই আঘাত পেল।

তিতু বলল, এখন এ সব কথা থাকুক। চাচা। তুমি যেম
ছিলে তেমনিই থাক। আমি অন্যত্র যাই।'

—আমি মনিবকে কি বলব ?

তিতু বলল, কথায় আছে বার বার, তিন বার। বহুকাল আ

হাট থেকে বেআইনে হাটতোলা বন্ধ করেছিলাম। থানা সেপাই আমাকে চোখ রাঙায়। তাতে বলেছিলাম, ভূদেব পালচৌধুরীর লেঠেল আমি। সেই একবার। এবার নিয়ে তার সঙ্গে যোগা-যোগটা হতে হতে হল না।

—তুই চলে যাবি ?

—তিনবারের বার ঠিক হয়ে যাবে। এরা সব কাছারির অনুগত। তোমার অনেক দিনের সেথো। এদের মনে ঘা দিয়ে আমি থাকতে চাই না।

—কোথায় যাবি ?

—দেখি, শুনেছি কলকাতায় অনেক পালোয়ান থাকে, তারা কুস্তি করে, মানুষ দেখে। বড় বড় লোকেরা পালোয়ান রাখে।

—তাই যা, ঠিকানা হদিশ করে দিচ্ছি। কাছারির মেহেরালির ভাই কলকাতায় আছে। সেও ওই সব খবর রাখে। জায়গা খুব খারাপ রে। বেশি দিন থাকলে লোনা লেগে যায়। সায়েবদের বড় বড় বাড়ি। বড়লোকদের বড় বাড়ি। আর সব জলা রে, পচা নর্দমা রে, খুব বিচ্ছিরি। কিছুদিন থাকলেই পালাতে হবে। পথে যেতে নানাবিধ ভয়। আর মেমদের তো মোটে আব্রু নেই! সব ঘোড়াগাড়ি চেপে ঘোরে।

—দেখতে পাব সবই।

—একবার ঘরে যাবি না ?

—না না। একবার গেলে মা কি যেতে দেবে ? সে কাঁদতে আরম্ভ করবে। আর মা কাঁদলে পরে আমি কেন যেন তাকে জোরাজোরি করতে পারি না।

ছেলেরা রইল।

তাদেরকে আমি কতটুকু দেখি ?

কলকাতা যাবার সময়ে তিতু বোনের বাড়ি গেল।

ওর পরেই হাসিমা। ছোট বোনটি ওর খুবই প্রিয়। আরো প্রিয় ভাগ্নে মাসুম

হাসিমা বিরক্ত হয়ে বলল, ভাইসাহেব! এ ছেলেকে বোঝান দেখি? এ তো এখনই সড়কি নিয়ে শিকারে যেতে চায়। সবদিকে আপনার মত।

—আমি না বাঘ ধরতে চেয়েছিলাম?

—তা আর মনে নেই? আম্মাকে কম কাঁদিয়েছেন আপনি?

—আমি ওকে কোন্ মুখে বারণ করব?

—আমি পারি না। ও তো বলে, আমি মামার কাছেই যাব।

—যাবে যাবে। বড় হোক আগে।

তিতু কলকাতা যাবে শুনে হাসিমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। তিতু বলল, কাউকে বলিস না। আম্মা যদি জানে, তবে কাঁদবে।

—আপনি সংসারী হলেন ভাইসাহেব। আব্বাজান তো সে কথাই বলতেন।

ভগ্নীপতি, তার মা, বড় ভাই, সবাই তিতুকে যথেষ্ট খাতির যত্ন করল। হাসিমা ওর হাতের মাপের চুড়ি দিল একটি। বলল, কলকাতায় রেশমী চুড়ি পাওয়া যায়। আমার জন্য নেবেন, ভাবীর জন্যেও।

পথে খাওয়ার জন্যে ফর্সা নেকরায় বেঁধে এতগুলো পিঠে দিয়ে দিন হাসিমা। মা গো, কলকাতা! কোথায় তাদের নারকেল-বেড়িয়া, কোথায় বাপের বাড়ি হায়দারপুর, আর কোথায় কলকাতা। হাসিমার শ্বশুর কলকাতা দেখেছে, যদিও নৌকো থেকে। মুর্শি-দাবাদে নবাবদের বেড়াভাসান দেখেছে। সে কত গল্প করে।

হাসিমার মনে দাদার জন্যে কষ্ট হল! সেই সঙ্গে খুব গর্বও হল। কেননা তার দাদা কলকাতা যাচ্ছে। এখন যদি দাদা চুড়ি আনে তাহলে তার সম্মানটা খুব বাড়ে। কলকাতার রেশমী চুড়ি কোন্ বৌ পরতে পারে? দাদার মনে থাকলে হয়। কম হট্টাকট্টা লোক, আর মেজাজী!

কলকাতায় পালোয়ান হয়ে কুস্তির মারপ্যাঁচ দেখিয়ে রোজগার ভাল লাগেনি তিতুর। এ কেমন শহর, যেখানে শাক, কলাপাতা সবই বিক্রি হয়? তিতুর ওস্তাদ বলল, শহর নাকি ক্রমক্রমিয়ে বাড়ছে। সে যখন এসেছিল, তখন চিৎপুরে বাঘের ভয়ে যাওয়া যেত না আর ওই যে চৌরঙ্গী, সেখানে ছিল ঘোর জঙ্গল।

কিছু দিন থেকেই হাঁপিয়ে উঠল তিতু। যে তাকে এনেছিল, সে দেশে গেছে, ফিরে এলেই তিতু চলে যাবে।

সে চলে যাবে শুনে ওস্তাদ অত্যন্ত অবাক হল। কলকাতায় কুস্তি এখন বড়লোকদের অত্যন্ত প্রিয় এক ব্যাপার। চিৎপুরের নবাবরা, বড় জমিদার ও ব্যবসায়ীরা, কিছু কিছু সাহেব মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে কুস্তির জন্যে টাকার তহবিল করেছে। চৈত্র থেকে আষাঢ় অবধি খেলা হয়। শনিবারে শনিবারে বাবুদের বাগানে ভিড় জমে। যে হারে, সেও টাকা পায়, যে জেতে সে পায় তার দ্বিগুণ। তিতু তো জিতছে, টাকা পাচ্ছে। ওস্তাদদের বলশক্তি কমে আসছে। নতুন এই শিষ্য যদি চার টাকা পায়, সে অন্তত এক টাকা পায়। এ বয়সে শিষ্যদের কাছ থেকে যা মিলবে তাই তো সব।

তিতু বলল, মন টেঁকে না।

তাকে যে এনেছিল, সে এসে পড়ল। তিতুকে চরগোবিন্দপুর যেতেই হবে। তাজুদ্দীন একটা হাংগামায় লাঠির চোট খেয়ে ঘরে পড়ে আছে। খুব একটা বিশৃংখল অবস্থা। যারা তিতুকে সেদিন চায়নি, তারাই আজ তাকে চায়।

ওস্তাদকে পাঁচটি টাকা দিল তিতু। বোনদের জন্যে, বউয়ের জন্যে কিনল রেশমী চুড়ি। তার ছেলে আর নিজের ছেলেদের জন্যে কিনল কাঠের খেলনা।

তারপর কলকাতাকে সেলাম জানিয়ে ঘরের পথ ধরল। কলকাতায় আর পা দিচ্ছি না। এখানে লোকে কচু, কলাপাতা, থোড়, মোচা কিনে খায়। শহর রমরমিয়ে আর না বাড়লেই ভাল। নানা দেশের লোক যত আসবে তত কলকাতার টান বাড়বে বাজারে। আর দেশগ্রাম থেকে সব কিছু চলে আসবে না কি? একেকটা

বাজারে কি জিনিসের ডাঁই রে বাবা! পুঁড়ার হাট যে নাম করা, তা একেকটা বাজারে যে একশোটা পুঁড়ার হাট বসে আছে।

এটা খুবই আশ্চর্য যে কলকাতার লোকেরা চাষ করে না, ধান কাটে না, ডিঙি বায় না, বর্ষার জল বাড়লে বাঁধের ধস আটকাতে ছুটে যায় না। তারা কোন রকম দেহের পরিশ্রমই করে না, তবু এত এত খায়!

ওস্তাদ বলল, আবার আসবে না?

—না ওস্তাদ, আর না।

তিতু তো ভবিষ্যত দেখতে পায়নি।

॥ চার ॥

ভূদেব পালচৌধুরীর নতুন লেঠেল সর্দার রামচাঁদ চক্রবর্তী তিতুকে দেখে বিরক্ত হল খুব। সে তার কুটুম্ব ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু নীলকুঠির গোমস্তা তারিণী সান্যালকে বলল, আমাদের মনিব যবন ছাড়া কারে ভাল দেখে না। তাজুদ্দীন থাকতে সাহেবের নীলচাষের কোন সাহায্য করতে পারি নাই। এখন পারব বলেও মনে করি না।

—তুমি মন করলে না হয় কি?

—আমার কি করার আছে?

—সাহেব তো প্রজার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে না, আর জমিদার তো জীবনে দেখতে আসে না। তুমি সাহেবের সঙ্গে মোটা টাকা বন্দোবস্ত কর না কেন? জমিতে দাগ মেরে দাও, বল যে জমিদার রাজী আছে। তারপর প্রজা চাষ করে কি না করে তা আমার ওপর ছেড়ে দাও দিখি।

—ভাই হে! তোমার শতজন্মের ভাগ্য যে সাহেবের কুঠিতে কাজ করছ। জমিদার যদি তাজহাটের ননী বসুর মত লোক হয়, তাহলে কি এত ভাবতাম?

—তা যা বলেছ। সে থাকে কলকাতা। কামাখ্যা দত্ত রাখতে পারল না, সে নিল। তা নিমকিমহালের সুখ ছেড়ে সে কি এখানে আসবে? মেদিনীপুরে তার ছেলে কিমকি দারোগা, কলকাতায় তার নিমক আড়ত। সব তো নায়েবের হাতে। নতুন জমিদারদের এই বড় মাহাত্ম্য। কেউ জমিদারীতে থাকে না।

—তাই তো বলছি, তার জমিতে তুমি দাগ দাও, নীল চাষ করাও, সে দেখতে আসবে না। সে শুধু খাজনা তুলবে।

—আমাদের জমিদার শুধু জানে "হরি হে" বলতে। সে বলে, নীল চাষে চাষীর লাভ নেই। আমারও লাভ নেই। নীল চষলে ওর

খাবে কি? আমার খাজনা আসবে কোত্থেকে? শোন কথা! কুঠির সাহেব নীল পেল, তুমি তোমার খাজনা পেলে। তুলব তো আমি। তা দু' ধারে মার খেতে খেতে প্রজা উচ্ছেদ হল কি না হল, বয়েই গেল।

—এই তো বুদ্ধির কথা।

—সে বুদ্ধি কে নিচ্ছে? পুরানো জমিদারগুলো সব উচ্ছেদ হয়, নতুন হাতে যায়, তাহলে কিছু ভাল হতে পারে। তারা তো যে যার মত দূরে থাকবে। আমরা চালিয়ে নেব। তেমন না হলে আর নীল চাষে উন্নতি নেই।

—যা হোক, যা হয় কর! কি জমির ফলন! ধানের চেহারা কি! দেখে আর সাহেবের বুক ফাটে। অমন জমিতে নীল বুনতে পেল না। এ দুঃখ কি যায়? দেখে আর আমাকে বলে, তুমি হারাম-জাদা আমার ভাল কিসে হবে তা দেখছ না।

—দেখি কি করতে পারি। তবে হাঙ্গামা হবেই। ও যবনগুলো ঠিক হাঙ্গামা বাধাবে।

—ভাই হে! আমিও লেঠেল রাখি!

—তাহলে কথা হয়ে গেল। আমি নীলের দাগ দিয়ে দেব। আমার কাছারির লেঠেল মাঠে নামলে যেন কুঠির লেঠেলের সাহায্য পাই।

—দাংগা বাধুক একটা। লেঠেলে-লেঠেলে মারদাংগা হলে কিছু লোক জেলে যাবে। তখন একটা ভয় ঢুকবে ওদের মনে। আমিও বলতে পারব, দেখ্ রে! ক্ষয়ক্ষতি যা হচ্ছে তা জমিদার বুঝবে, রায়ত বুঝবে। তোরা কেন মাঝে যাস?

—ওই নতুন সর্দারটা জেলে যায় তবে তো হয়।

—ও আগে যাবে। বেটা হাংগামার জন্যে মুখিয়ে থাকে। হাট-তোলা তুলতে যাও না, টের পাবে। ও ধর্মপুত্তুর হয়েছে! বলে, হাটুরে মেরে তোলা তুলতে দেব না।

—ওঃ! উনি হাট পেয়াদা নাকি?

—পেয়াদার বাপ। যত কথা বললাম তা যেন গোপন থাকে।

দেখ! যা যা করতে চলেছি সবেই মনিবের অনিষ্ট হয়। মনিবের ক্ষতি করাটা মহাপাতকী হয়, তেমন কাজ করতে যাচ্ছি, এতে মনে কি কষ্ট হচ্ছে না? হচ্ছে খুবই। তাহলেও আমি নাচার। আমার এখন টাকার দরকার।

এমনি করেই সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আর এমন সব ষড়যন্ত্রের জন্যেই তো তিতুর জীবনও পালটে গেল ক্রমে। এমনি করেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল সব।

কর্ণওয়ালিসী ব্যবস্থায় বাংলার মাটিতে জন্মাচ্ছিল নতুন নতুন ফসল যত। কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল ভূদেব পালদের সরিয়ে ফেলা। ওরা প্রাচীনপন্থী। কোম্পানী তোমাকে যত সুবিধে দিচ্ছে তা তুমি বুঝতে অপারগ।

কোম্পানীকে তুমি তো বাঁধা খাজনা দেবে। এ ব্যবস্থা চির-স্থায়ী হয়ে গেল। পৃথিবীর মানচিত্রে বৃটিশ অধিকারের লাল দাগ-গুলি চিরস্থায়ী। সব লাল হয়ে যাবে। তোমার দেয় কোন দিন বাড়বে না।

কিন্তু কোম্পানী তোমাকে অধিকার দিচ্ছে, তুমি প্রতি বারো বছরে প্রজার দেয় খাজনা বাড়াতে পারছ। সেটা বারো বছরে বাড়াচ্ছ না তার আগে বাড়াচ্ছ, সেটা কোম্পানী দেখতে যাবে না। কোম্পানীর এ ব্যবস্থার ভাল দিকটা দেখতে শেখ—দেখতে শেখো।

মাটির সঙ্গে কোন যোগ রাখার দরকার তোমার মোটেই নেই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হয়ে গেছে, বই কেতাব ছাপা হচ্ছে, গঙ্গার বুক দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাচ্ছে পুর্বাঞ্চলে পণ্য। তুমি যদি চক্ষুষ্মান হও, তাহলে একই সঙ্গে ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও বিদ্যোৎসাহী হতে পারো।

কোম্পানীর বেনিয়া লক্ষ্মীকান্ত ধরকে দেখ, গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্ট আর জেনারেল স্মিথের দেওয়ান রামনারায়ণ রায়কে দেখ। হুই-লারের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নাম শোননি? বাণিজ্যসূত্রে কোটিপতি রামদুলাল দে, লবণের এজেন্টের দেওয়ান রামহরি বিশ্বাস,

রসদের ঠিকাদার গোকুল মিত্র, পামার কোম্পানীর খাজাঞ্চি গঙ্গা-নারায়ণ সরকার—কত নাম বলব ?

কলকাতার বন্দর থেকে বস্তা বোঝাই তুলো ও চাল, মণ মণ চিনি-সোরা-সুঁট-রেশম-নীল-হিং-সোহাগা-ভেরেণ্ডা, তেল-লবঙ্গ-নারকেল তেল-সুতো-হাতির দাঁত-মাজুফল-মোষেরশিং-পিপুল-মঞ্জিষ্ঠা-জায়ফল-কুচিলা-রক্তচন্দন-কুসুম ফুল যাচ্ছে চলে। সিন্দুক বোঝাই আফিম, থান বরাদ্দে নানা রকম কাপড় ও ছাগলের চামড়া, জোড়া হিসাবে শাল ও গোছা হিসেবে বেত, এমন করে দশ থেকে বারো কোটি টাকার মাল আমরা রপ্তানি করছি। লবণের কারবারে লাভ রাখছি দু কোটি টাকা।

এই বিপুল লেনদেনের কারবারের বিশাল ব্যাপার কেমন করে চলতে পারে যদি না জমিদার কোম্পানীর বংশবদ হয় ? সবই তো যোগান দেবে এ দেশের মাটি।

সে মাটির মালিক তোমরা। এই বিশাল, বিপুল অর্থ চলাচলের ব্যাপারে তোমরা সামিল হও। কারবার কর, দেওয়ানি কর, বেনিয়া হও, ঠিকাদার হও।

সে জন্যে তোমাদের কলকাতায় থাকা দরকার। প্রজার কাছ থেকে নির্মমভাবে রাজস্ব তুলতে পুরানো জমানার জমিদাররা অক্ষম। তাই তো নিয়ম করা হল যে বন্দোবস্তের নিয়মে সরকারের ঘরে দেয় খাজনা না পৌঁছলে ওদের জমিদারী নিলামে উঠবে।

এমন জমিদারী নিলামে উঠছে। আর তোমরা, যারা মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, মহাজন ও ব্যবসায়ী সে জমিদারী কিনছ। জমিদারদের নায়েবরাও টাকা জমা না দিয়ে তালুক তুলছে নিলামে, নিজেরা হচ্ছে নতুন মালিক।

তোমরা কলকাতায় থাকছ। তালুক মুলুক থেকে খাজনা তোলার ভার দিচ্ছ পত্তনিদার, গাঁতিদার, দরপত্তনিদার, এমন লোক-দের। প্রত্যেকের চাহিদা প্রজাই মেটাবে। উত্যক্ত হয়ে তারা যদি

পালাতে যায় তাহলে, তোমাদের সুবিধার্থে রচিত সপ্তম আইনের বলে তাদের শাস্তি দিও।

কোম্পানীর এ ব্যবস্থার সুফল ভূদেব পালের মত প্রাচীন জমিদার বোঝে না। কোম্পানীর এখন দরকার ননী বসুর মত 'অনুপস্থিত জমিদার'।

ভূদেব পালচৌধুরী শান্তিপ্রিয় প্রাচীনপন্থী, ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত মান্য করে। জমিদারী রাখার ক্ষমতা তার নেই, সে তা জেনেই লেঠেল রাখে। তার চারদিকে বিভিন্ন 'ইনডিগো কনসার্ন'-এর কুঠি। ওদের সঙ্গে তার যে ঠাণ্ডা লড়াই চলে, তা ঠেকাতেই লেঠেলরা ব্যস্ত থাকে। বিশেষ করে ধান কাটা ও বোনার মাঝামাঝি সময়টিতে নীলকরদের জুলুম বাড়ে।

ভূদেবের ধারণাও ছিল না যে রামচাঁদ কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। রামচাঁদের অবস্থার উন্নতি তো চোখে দেখাই যায়। তার বিষয়ে প্রজাদের নানা অভিযোগ লেগেই থাকে।

জমিদার বাড়ির পালাপরব, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান—এ সবে 'মাঙ্গন' দেওয়া প্রজাদের কাছে মোটামুটি বাধ্যতামূলক। তবে এ নিয়ে ভূদেবের তেমন জোরাজোরি নেই। রামচাঁদ তার বাড়ির পালাপরবে যে প্যালা তোলে তা সে জানত না।

যেমন জানত না, তিতু কুস্তি জানে এবং ভাল তীরন্দাজ। তিতু বলল, তীর খেলা, লাঠি খেলা, এ সব খেলা দেখিয়ে যাব যদি বলেন।

—না না!

—বল পরীক্ষা, দক্ষতা পরীক্ষা, এমন কিছু চোখে দেখতেও ভূদেব নারাজ। তারপর ভূদেবের কি যেন দরকারী কথা মনে পড়ল। সে বলল, হাটতলায় কি হয়েছে বল তো? নায়েব বলছিল।

—কি হয়েছে?

—নীলকুঠির পেয়াদা আসে ঝুড়ি নিয়ে, নায়েবমশাই দাঁড়িয়ে থেকে তোলা তুলে দেন। হাটের লোকেরা বলছে, জমিদারকে দেব, আবার কুঠির পেয়াদাকেও দেব, অত দিলে তো বাঁচি না।

—হ্যাঁ, এ সব চলছে বটে।

—মানুষ তো বাঁচে না।

—কি করা যায়?

—বন্ধ করে দিলেই হয়।

—না না, দাংগা হবে।

—কিছু হবে না।

—দেখ!

—তিতুরা জনা দশেক হাটে ঘুরতে থাকল। কুঠির পেয়াদা হাটে কেন? কড়ি ফেল জিনিস নাও।

এমন ব্যবস্থায় রামচাঁদ ও তারিণী দুজনেই যারপরনাই অপমানিত হল।

এর পরে পরেই হঠাৎ চরগোবিন্দপুরের সুদূর পুবপাড়ায় বেধেছিল গোলমাল। তারিণী ও তার পেয়াদারা সেখানে তৈরি জমিতে, ধান বীজ ফেলার সময় নীলের বীজ ছিটিয়ে এসেছিল। কান্নাকাটি হা-হুতাশ করে লাভ নেই বাপ সকল। তোমার জমিদার জানে। নায়েব জানে, তুমি না জানলে কার কি এসে যায়? বীজ ফেলে গেলাম, লেঠেলরা দিনে রাতে পাহারা দেবে, তোমার সাধ্য কি হয়কে নয় কর?

তিতু তেল মেখে স্নান করতে যাচ্ছিল। এ খবর পেয়ে তখনই সে সকলকে ডাকে ও বলে, সদরে যাব, মনিবের হুকুম নেব, তাতেও অনেক সময় যাবে। কেউ নায়েবকে খবর দিক, আর সবাই যাই।

কুঠির লেঠেলদের সঙ্গে দাঙ্গা করার প্রস্তাবে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হয়! তারা কপালে ফেটা বেঁধে, কোমরে গামছা বেঁধে লাঠি নিয়ে উড়ে চলে যায়। লাঠিতে ভর দিয়ে ওপরে উঠে তিতু একেক লাফে অনেকটা এগোয়। রহিমদ্দি পাকা দাড়ি নেড়ে যে বলে তার মানে হল—সম্বন্ধীরা অনেক দিনই এই তালে ছিল আর শ্যালক নায়েববাবুও এতে নির্ঘাত আছে। সে যা হোক, আজই প্রমাণ হয়ে যাবে মায়ের দুধ কারা খেয়েছে শৈশবে। কুঠির লেঠেলরা না তারা।

কুঠির লেঠেলরাও তৈরি ছিল। কাছারির লেঠেলদের আসতে দেখে রায়তরা বুকে জোর পায় ও যে-যার খেঁটে আনতে যায়। এই বেগুন লাউ তুলে নিয়ে গেল, এই গরু নিয়ে আটক করল, এই পাঁচ-কড়ির দুধ কিনে একটি কড়ি ঠেকাল, কুঠির লোকদের ওপর ওদের অনেক দিনের রাগ।

তারিণী চেঁচায়, কাছারির লোকগুলোকে ফেলে দে, কুঠির মান বাঁচা, সব একেক টাকা পাবি।

লাঠি বনাম লাঠি, তিতুয় চেহারা অতি ভীষণ হয়। তাকে দেখলেও এখন ভয় করে। প্রথমে লাঠি, তারপর ধস্তাধস্তি। কুঠির লেঠেলরাও কম যায় না। ফলে ঘণ্টাখানেক ভীষণ লড়াই হয়। তারিণীর ঘোড়ার পিঠে লাঠি পড়ে। ফলে ঘোড়া দৌড়ায়, তারিণী ছিটকে পড়ে। তখন তার মাথায় পড়ে লাঠি। তারিণী পড়ে যেতে তবে কুঠির লেঠেলরা রণে ভঙ্গ দেয়।

রামচাঁদ যা যা চেয়েছিল ঠিক তা হয় না। অন্য রকম ব্যাপার হয় সব, হিজিবিজি। ঘটনার পরিণাম রামচাঁদকেও খানিক বিবশ করে রেখে যায়।

তারিণী মরে যায়। যেহেতু তারিণী তার মেয়ের শ্বশুর, সেহেতু রামচাঁদ পড়ে বিপদে। তারিণী নেই যে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে তাকে বাঁচাবে। কুঠির লেঠেলদের দুজন নিহত, বত্রিশজন জখম। কাছারির লেঠেলদের জনা তিরিশ জোর জখম।

চালান যায় দুদলই। কুঠির লেঠেল সর্দার মোতাহার মণ্ডল বলে, আমরা কিছু জানি না। কাছারির নায়েবে আমাদের তারিণী-বাবুতে কথা হয়েছিল। তারিণীবাবু বলেছিল, তাতেই আমরা যাই।

নীলকুঠির কুঠিয়াল সবই জানত। তবে আদালতের সামনে একটা কথা তো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে যেমন পরিস্থিতিতে নীল বোনা হয়েছে, সেটি কুঠিয়ালের (সাহেব হলেও) সপক্ষে যায় না।

জমিদারের সঙ্গে কুঠিয়ালের বন্দোবস্ত হয়ে গেলে তবেই প্রজার আপত্তিতেও নীল বোনা চলে। তেমন হলে কাছারির লেঠেলদের কাঁসানো চলত।

এখানে পরিস্থিতি তো তা নয়। এই জমিদার নীল চাষ করতে দেবে না তার জমিতে। সে এই নিয়ে অনেক দিন বাধা দিচ্ছে। তবু নীল বোনা হয়েছে।

ফলে অপরাধী কুঠির লেঠেলরাই। কুঠিয়াল দেখল সে খুব সুবিধে করতে পারবে না। ফলে সে জানাল যে যা করেছে তার নায়েব স্বদায়িত্বে করেছে। সে এ বিষয়ে কিছু জানে না। তার নায়েব আর কাছারির নায়েব খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, তা সে দেখেছে।

ফলে মামলাটি দাঁড়াল দাঙ্গা হাঙ্গামায়। দু'পক্ষের শ'দুয়েক লোক লাঠালাঠি করেছে। কার লাঠিতে কে মরল বিচার করা কঠিন। কুঠির লেঠেলরা দেখল, সাহেব তাদের বিষয়ে কোন দায়িত্ব স্বীকার করছে না। ফলে তারা তিতুদের বলল, ভাই রে! মিছাই এ-ওকে পিটালাম। যার জন্যে চুরি করলাম, সেই যে চোর বলছে।

—আবার কুঠির নেমক খেও, আবার রায়ত ঠেঙাতে যেও! স্বভাব কি পাল্টাবে?

এই মামলায় রামচাঁদের নাম বার বার বলল কুঠির লেঠেলরা। ফলে রামচাঁদের অবস্থা যথেষ্টই কাহিল হয়ে পড়ল।

সে যা চেয়েছিল তা হল। তিতুর তিন বছর, এবং অন্যদের এক থেকে আড়াই বছর, নানা মেয়াদের কারাদণ্ড হল।

কুঠিয়াল সাহেবও 'ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা দেখতে যত্নবান থাকবে' বলে হুঁশিয়ারি পেল।

সাহেব সরোষে গজরাতে গজরাতে ফিরে এলো। তার সমগোত্রীয় কুঠিয়ালরা বলল, সিধা কথা। চাপ সৃষ্টি করে যেতে হবে। নীল চাষের ব্যবসার প্রসার চাও তো নীলকরদের যথেচ্ছ জমি-মালিক হতে দিতে হবে। একবার নীলকররা জমিদার হয়ে বসুক, তখন নীলে মুনাফা উঠবে।

—কোম্পানী তা দেবে?

—দিতেই হবে।

—আমার নায়েব ছিল ইডিয়ট।

—তাতে সন্দেহ কি? বুদ্ধিমান হলে দাংগা বাধিয়ে দিয়ে সরে

পড়ত। সামনে থাকত?

—কাছারির সর্দার তিতুর মত দুর্ধর্ষ লোককে পেলে দেখিয়ে দিতাম।

—জেল থেকে বেরোলে ওকে নাও।

—দেখাই যাক।

কাছারির অবশিষ্ট লেঠেলদের ইজ্জত খুব বেড়ে গেল। অমন করে ছুটে এসে তাদের বাঁচিয়েছে, নিজেরা জখম হয়েছে তবু লাঠি ছাড়েনি, তাতে পুবপাড়ার লোকরা এসে লেঠেলদের পাঁঠা খাইয়ে গেল। ভূদেব পালচৌধুরী এ ব্যাপারে কিছু জানতই না। তবু মাঝ থেকে তার অনেক সুনাম রটল।

হ্যাঁ, প্রজাপালক বটে। যেমন জানতে পারল যে কুঠির নায়েব লেঠেল নিয়ে চড়াও হয়েছে, অমনি তার লেঠেলদের পাঠিয়ে দিয়েছে। আর অমন কথা কে কবে শুনেছে যে যারা কাছারির কাজ করতে গিয়ে জখম হল, তাদের প্রত্যেককে দুটো করে টাকা দেয়? যারা চালান গেল, তারাও তো শুকনো পেটে যায়নি? মনিবের খরচে খেতে খেতেই পথে হেঁটেছে।

এই না হলে জমিদার? হবে না কেন? ওরা তো নিলেমে লাট কিনে জমিদার হয়নি। সেই মুর্শিদকুলির সময় থেকেই ওরা এখানে আছে।

ভূদেব পালচৌধুরী প্রথমে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। শ্বশুরের সঙ্গে সে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যায়। সব ঘোরাঘুরি করে শ্বশুরের ভরসায়। শ্বশুর বলল, তুমি এমন ভীতু কেন হে! যা হয়েছে তা হয়েছে। তোমার বাবা যেমন ছিল, তুমিও তেমন হয়েছ। একটু হাঁকডাক শুনলেই 'মদনমোহন' ডেকে মন্দিরে গিয়ে শুয়ে পড়। বাপু হে! অত শান্ত হলে আজ চলে?

—এ কি হল! ব্রহ্মহত্যা হয়ে গেল!

—ব্রহ্ম যদি সেধে হত্যা হয় সে তোমার দোষ নয়। দোষ মনে কর, প্রাচিত্তির কর, ব্রাহ্মণকে গো-দান কর। তবে রামচাঁদ থাকতে তোমার নিস্তার নেই। সে-ই এ কাজ করাল। তারিণী

তো তারই কুটুম্ব। ওকে আর রাখলে ও তোমার খাজনা চেপে দেবে, লাট নিলামে তুলবে, স্বনামে কিনবে। আর নীলকরকে চরের জমি তুলে দিল বলে। ওকে সরাও।

ভূদেবের ভাই, স্ত্রী, ছেলে, সকলে এক কথাই বলল।

রামচাঁদের নামে ছি ছি উঠে গেছে। তাকে রাখলে পরে দুর্নামের অন্ত থাকবে না।

রামচাঁদ এর মধ্যেই তার বেয়াইয়ের হত্যাকারী বলে যথেষ্ট ধিক্কার শুনছে। তার মেয়ের বাপের বাড়িতে আসা বন্ধ হয়েছে। ছোট মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেছে। তার বাড়িতে ভিখিরি বোষ্টম ঢুকছে না। স্বজাতীয় ব্রাহ্মণরা ছি ছি করছে সব সময়ে।

রামচাঁদের বউ বলল, জীবনে জানিনি এমন কারে পড়ব! এ কি হল মা? এখন মেয়ের বিয়ে হবে না, ছেলের পৈতে দিলে কেউ আসবে না। একঘরে না হয়েও একঘরের বাড়া হয়ে থাকব কি করে?

রামচাঁদ গুম হয়ে বসে থাকল। সে বলল, মেলা ফ্যাচফ্যাচ কোর না। চুপ করে থাক। সময়ে সব সহজ হয়ে যাবে। সময়ের নাম মহাশয়।

সময়ে সব সহজ হল না।' এমন কথা বলতে ভূদেব পালচৌধুরীর জিভ এড়ে গেল, গলা শুকিয়ে গেল। তবু সে রামচাঁদকে ডেকে বলল, এখন তুমি কিছু দিন ছুটি নাও।

—ছুটি নেব?

—হ্যাঁ, আর অন্যত্র কোথাও···আমি আর পারছি না তোমাকে রাখতে। জীবনে এমন কথা বলতে হবে ভাবিনি, তবু বলতে হল, মদনমোহন জানেন আমার বুকে কি হচ্ছে।

অন্যায় যে করে সে অন্যায় করার শক্তিও রাখে। তাই রামচাঁদ সরোষে বলল, ব্রাহ্মণকে এমন নির্দোষে অপমান করলেন, ধর্মে তা সইবে না।

সবাইকে সে উঁচু গলায় বলল, বাবু যবন প্রেমে অধির হয়ে আমাকে তাড়াল। আমি যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হই তবে এর শাস্তি

একদিন স্বচক্ষে দেখব।

সদাপটে উঠে গেল সে অন্যগ্রামে। তারিণী মরে যেতে যে শূন্য-স্থান তৈরি হয়েছিল সেখানেই ঢুকে পড়ল কিছুকাল বাদে। কুঠি-য়ালের নায়েব হয়ে পাশে বসে সর্বদা সুযোগ সন্ধানে না থাকলে ভূদেবের জমিতে নীল চাষ সে সম্ভব করবে কেমন করে?

এখন ঘটকমলাপুরের আঁবু মহম্মদকে ভূদেব নায়েব পদে বসাল। আবু মহম্মদ কম কথার লোক। বৈষয়িক মারপ্যাঁচ ভাল বোঝে। ভূদেবের শ্বশুর তাকে ডেকে পাঠাল। ভূদেব বুঝল তার জমিদারীর যে অংশে অধিকাংশ রায়ত মুসলিম, সেদিকটা এ থাকলে ভালই চলবে।

রামচাঁদ এটি পছন্দ করল না। এই নীলকুঠির সঙ্গে নদীয়ার ভূদেব পালচৌধুরীর যে শত্রুতা বেধে থাকল, তা থেকে আরো পঁয়-ত্রিশ বছর বাদে আগুন জ্বলেছিল। তখন ভূদেবের ছেলে জমিদার, রামচাঁদের ছেলে কুঠির নায়েব। সে নীলবিদ্রোহের সময়ে। তিতুর কাহিনীতে নীলবিদ্রোহের কাহিনী প্রক্ষিপ্ত ও অবাস্তব।

আর হায়দারপুর গ্রামে রোকেয়া শুরু করল উপবাস, পীরের দরগায় শিরনি মানত। সংসারের হাল সে ছেড়ে দিল বড় বউ ও ছোট বউয়ের হাতে। তিতু জেলে যাবার পর থেকে ওর ছোট ভাই বউ নিয়ে এখানে। এমন বিপদে বাবা, মা, ভাবী, তিনটে ভাতিজা-কে ফেলে রেখে সে দূরে থাকতে পারছিল না।

কোন দিকে চেয়ে দেখে না রোকেয়া। একটি দিন যায় আর সুতোয় সে গিঁট দেয় একটি করে। এত দিন হল তার তিতু জেলে গেছে। জেলে সে কেমন করে আছে? কেমন বিছানায় ঘুমোচ্ছে? সবাই দাংগা করল তো শুধু তার তিতুর এত দিন হল কেন? সে কেমন হাকিম, যে তিতুকে জেলে দেয়? তিতুর চওড়া কপাল, ধব-ধবে রং, উজ্জ্বল চোখ, আশ্চর্য হাসি, এ সব দেখেও কি হতভাগা হাকিম বুঝল না যে এ লোক কোন অন্যায় করতে পারে না? কোথাকার অনামুখো হাকিম গা? তার দয়ামায়া থাকতে নেই?

ছোট ছেলে নিহাল, নলু যার ডাক নাম, সে বলল, আম্মা! এত

কথার উত্তর কি জানি? বড় ভাই সেখানেও নিজের দল গড়ে নিয়েছে দেখ। তোমার মনে নেই, যে ছোটবেলা সে বাঘ ধরতে চেয়েছিল?

—খুব মনে আছে, অ গওহর, শোন্ তোর আব্বার কথা। বলে কি, বাঘ আনব মা। একটা বাঘ ঘরে আনলে কত সুবিধে। শোন্ কথা! বাঘ ঘরে থাকলে সুবিধে আবার কি?

এ কথায় তিতুর বড় ছেলে বলল, বাঘ ধরেছিল আব্বা?

—নাঃ। পালিয়ে গিয়েছিল।

তিতুর কথা বলতে বসলে তবে রোকেয়া খানিক সহজ হয়। ছেলে গোখরা সাপের লেজ মাটিতে পা দিয়ে চেপে ধরে, মাথার ঠিক নিচে গামছা জড়ানো হাতে চেপে মুঠ করে টেনে টেনে মেরে ফেলেছিল। সেথোদের নিয়ে বনে কত হরিণ সে মেরেছে। হরিণ মারলে রোকেয়া বড় রাগ করত। অমন চোখ দুটি, মারিস কি করে? ভাইকে নিয়ে ঘরের চাল ছাইবে যখন, সে যেন তখন পাকা ঘরামি।

ভূত-প্রেত-জিন-পরী—ছেলেকে ভয় দেখাও দেখি? বালক তিতু বায়না করত, দেখব, দেখিয়ে দাও।

তিতুর আসার সময় যখন এগিয়ে এলো, তখন একদিন রোকেয়া চেয়ে দেখল পুত্রবধূর দিকে। দেখে তার চোখে জল এলো। তুই আমার তিতুর বউ মা, কত গোনাহ হল আমার যে তোকে চেয়ে দেখিনি? চুলে জট, ঠোঁটে পান নেই মুখ যেন মলিন।

ক্ষার খৈল নিয়ে রোকেয়া বউকে নিয়ে ঘাটে গেল। গা মেজে রাখতে। [illegible] দিল। বলল, হাতে নতুন চুড়ি পরিসনি?

মদনমোহন জানেন আমার বুকে কি হচ্ছে। [illegible] বলল জওহারের বাপ

দিল, মাথা [illegible]

এ তো সেই চুড়ি। মায়মুনা সলজ্জ মুখে [illegible]

এলে পরে পরতে বলেছে হাসিমা।

—তাই পরিস।

সেদিনই বিকেলে রোকেয়া নিহালকে ডেকে বলল, জোলাপাড়ায় খবর করতে হবে। তিতু আসবে। বউদেরকে নয়া কাপড় দেব।

নিহাল বলল, সে যখন আসবে তখন আমের গুটি বড় হয়ে যাবে, তাই নয় ? দেখ জওহার। এই গাছটা তোর আব্বা আর আমি লাগিয়েছিলাম। কত বড় হয়েছে।

তিতুর আসার সমকালে হাসিমা এসে পড়ল গরুর গাড়ি চেপে। বড় ভাই ঘরে আসছে, সে কেমন করে দূরে থাকবে ?

হাসিমাটা বড্ড দূরে পড়েছে। পরিবারের কোন ব্যাপারে তার আসা হয়ে ওঠে না।

রোকেয়া রাতে স্বামীকে বলল, এবারে সে এলে আমি দূরে যেতে দিচ্ছি না।

—মনিব তো লোক পাঠাচ্ছে।

—পাঠাক। নয় কম খাব কম পরব। ছেলেকে চাকরি করতে দেব না।

—সব কম খাবে ? পান দক্তাও ?

—ওইটি পারব না।

রোকেয়া অনেক দিন বাদে হাসল। বলল, তিতু কলকাতা থেকে কেমন সুবাস দোক্তা এনেছিল গো।

নিসার বলল, দেখি, আমি-তুমি এক রকম বলি। সে আবার কি করে দেখ। নলুকে দেখ আর তিতুকে দেখ। নলু হল আমার মত সংসারী। তিতু যেন শা-বাদশা। ভুলে আমাদের ঘরে জন্মেছে। কত ছোট বয়স থেকে কেউ কারো ওপরে অন্যায় করলে সইতে পারেনি। গায়ের পিরান অপরকে খুলে দিত, ফকিরদেরকে কাঠাভর চাল ঢেলে দিত।

—না না, এবার ঠিক বুঝবে। ছেলেরা আছে, আমরা বুড়ো হচ্ছি, সে কিছু বুঝবে না ?

॥ পাঁচ ॥

জেল থেকে বেরিয়ে আসার আগেই তিতু সৈয়দ আহম্মদের নাম শুনেছিল।

বহুকাল আগে যাকে দেখেছিল, সেই ফকিরের কথা তখনও সম্পূর্ণ ভোলেনি তিতু। তখন তার লুকিয়ে থাকা, আত্মগোপন করে চলে যাওয়া, মজনু শাহের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা আর কোম্পানীর ফৌজ-কে হারানো, এ সবই মনকে অভিভূত করেছিল।

নিজে যখন সাহেব বিচারকের সামনে দাঁড়াল তখন সে বুঝেছিল যে যারা দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাদের প্রাণে ভয় ধরিয়ে লড়াই করেছিল যারা, তারা শূরবীর, রুস্তম।

তিতু বীরত্ব ভালবাসে।

কিন্তু এখন যে আবার আরেকটা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হতে পারে না তাও সে বোঝে।

সবচেয়ে দুঃখ হয় তিতুর, তার দেশঘরের মানুষদের কথা ভেবে। ওরা যেন কোন অন্ধকারে পড়ে আছে।

এই তো কলকাতা শহর। কি তার রমরমা। বড় বড় বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া-পালকি, স—ব চলছে। একেকটা বাজারে যত মাছ-মাংস-ডিম-তরকারি-ফল দেখা যায়, হায়দারপুরের মত দশটা গ্রামে তা জোটে না। এখানে মাদ্রাসা আছে, ইস্কুল আছে, কত কি আছে।

তিতুর অঞ্চলের লোকরা এ সব কিছুই জানে না। জমি-জেরাত, হাল-বলদ, হাঁস-মুরগি, এই সব নিয়ে তারা থাকে। পরনে কাপড় জোটে না, চালে খড় থাকে না, পেটে ভাত থাকে না।

তারা গোমস্তা—নায়েব—হাটপেয়াদা—কুঠির পেয়াদা—মোল্লা-মৌলভী—ভূত-প্রেত-জিন-পরী—পীর—মিশকিন সকলকে ভয় পায়। বড় ভয় তাদের। এমন ভীত, এমন সংকুচিত থাকলে হবে কেন?

সৈয়দ আহম্মদের নাম শুনে তাই তিতু আকৃষ্ট হয়। জেল থেকে সে যখন বেরোয়, তখনই সে শোনে, সৈয়দ আহম্মদ কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর প্রার্থনাসভায় কলকাতার গরীব মুসলমানরা দলে দলে যেত। তিনি এক নতুন ধর্মমতের খবর এনেছেন।

তিতু গিয়েছিল কলিঙ্গা। সেখানে মুসলিম বসতি। তারা তিতুকে সমাদরে রাখল। বলল সৈয়দ আহম্মদের কথা।

—তিনি কি পীর?

—তিনি নিজেকে পীর বলেন না, মুরিদ করেন না কাউকে। তিনি একেবারে অন্যরকম।

—নিজের কাজের জন্যে টাকা চায়?

—না?

—রোগ ব্যামো সারান?

—না।

—তিনি কে?

—তিনি ওয়াহাবী।

—ওয়াহাবী?

—হ্যাঁ। তোমাকে নিয়ে যাব একজনের কাছে। তিনি দিল্লীর বাদশাহ বংশের লোক। নাম জানি না। আমরা তাঁকে মির্জা সাহেব বলি।

কলকাতা থেকে অনেক দূরে চিৎপুরে মির্জাসাহেবের আবাস। দোতলা ইটের বাড়ি। নিচে থাকে কিছু তুলো ধুন্যার। তারা সারাদিন শহরে ঘুরে কাজ করে, বিকেলে ফিরে আসে। চিৎপুরে চারদিকে ঘোর ঝোপজঙ্গল। বাঘ সেদিনও ছিল। এখন বাঘ নেই, তবে শিয়াল, হায়েনা, নেকড়ে বিস্তর। আর সাপের তো কথাই নেই।

মির্জা সাহেব বুড়ো হয়েছেন, তবে শক্তই আছেন। তিনি তিতুকে রুমালী রুটি ও কাবাব খাওয়ালেন। তিতু জীবনে কখনো এমন আশ্চর্য খাদ্য খায়নি।

—সৈয়দ আহম্মদের কথা জানতে চাও কেন?

—তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

—সে পাগল।

—কেন ?

—বেশ ছিল। ওয়াহাবী হয়েছে।

—ওয়াহাবী ব্যাপারটা কি ? আমি তো কিছুই জানি না, আপনাকে জিজ্ঞেস করছি।

—হিন্দুস্তানের মুসলিমরা সিয়া আর স্থন্নীর ব্যাপারেই দুই ভাগ। আবদুল ওয়াহাব এক নতুন মত আনল। আনল তো আনল। সে তো ছিল আরবে। কে তা জানতে গিয়েছিল ? সৈয়দ আহম্মদ হিন্দুস্তানে সে কথা প্রচার করছে। কখনো দেখলাম না যে লোকটা স্থির হয়ে কোথাও বসল। অথচ অত্যন্ত ভাল লড়িয়ে, এলেম ছিল।

—তিনি লড়াই করেন ?

—করেছে অনেক। রায়বেরিলিতে ওর জন্ম। বেশ কিছু দিন টংকের নবাবের সেপাই ছিল। তারপর ও গেল দিল্লী। তখনই ওকে দেখি।

—তারপর ?

—সেখান থেকে ও চ'লে যায় আরব। ফিরল যখন ও এক নতুন মানুষ। ফিরল ওয়াহাবী হয়ে আর কত তাড়াতাড়ি নিজের ফৌজ তৈরী করে পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংয়ের সঙ্গে লড়তে শুরু করল। বহু যুদ্ধ ও করেছে, আর ওর সেপাইদের হাতে রণজিৎ সিংহের লোকজন প্রচুর মরেছে।

—এখনো কি যুদ্ধ করেন ?

—হিন্দুস্তানে ঘুরে ঘুরে নিজের মত প্রচার করে যখন, তখন যুদ্ধ করে না।

—রণজিৎ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করেন কেন ?

—সে কেন ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করল ? সে কেন টংক, পেশোয়ার এ সব জায়গায় আজাদী ছিনিয়ে নিল ? সে কেন বীরভূমি পাঞ্জাবকে ইংরেজের গোলাম বানাল ? এই সব কারণে তার রাগ।

—কলকাতায় এসেছিলেন ?

—এসেছিলই তো।

—এখন কোথায় ?

—মক্কায় গেছে।

—মক্কা! সে যে অনেক দূর।

—আমি তো যাচ্ছি।

—আপনি আমীর মানুষ!

—তুমি যাবে ?

—কেমন করে ?

—আমার বয়স হয়েছে। একজন শক্ত লোক সঙ্গে থাকলে ভরসা পাব।

—নিয়ে যাবেন আমাকে ?

—নিয়ে যেতে পারি।

—কবে যাবেন ?

—মাসখানেক বাদে।

—আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

—কত দূর ?

—বেশি দূর নয়।

—এমনি করেই তিতুর ভাগ্য স্থির হয়ে যায়। হায়দারপুরের বাড়িতে শোকের ছায়া নতুন করে নেমেছিল। রোকেয়া কেঁদে বাঁচেনি। কিন্তু 'মক্কা যাব' বললে কোন্ মুসলিম বলবে 'না, যেও না' ?

তিতুর সম্মানও খুব বেড়ে গিয়েছিল। দাংগা-হাংগামা করে জেলে যাবার ব্যাপারে সবাই ওকে শ্রদ্ধাই করেছে। এই তো সৎ মুসলিমের কাজ। যার নিমক খেয়েছ তাকে বাঁচাবার জন্যে লড়েছ, মেরেছ, জেলে গিয়েছ। তুমি সৎ ও বিবেকী বলেই তো মনিব এমন করে তোমার খোঁজ করছে। তোমাকে সে সম্মান দিয়ে ডাকছে। আর সেই নায়েবটার কীর্তি শোন। সে গিয়ে নীলকুঠির নায়েব হয়েছে।

—তুমি তো অনেক দিন ছিলে না। এর মধ্যে খুব একটা কাণ্ডই হয়ে গেল।

তিতু বলল, ব্যারাকপুরে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ !

তাজুদ্দিনের জামাই বলল। তিতু এসেছে, তাই আজ দলিজ জমজমাট। তিতুর বড় ছেলেই তো কৈশোর কাটিয়ে যৌবন ছোঁয় ছোঁয়। মাসুমও কত বড় হয়েছে। হাসিমা আর মায়মুনা খাঞ্চা ভরে পান সেজে পাঠাচ্ছে, বদনা ভরে পানি। হাসিমা খুব খুশি।

—আম্মা! বড় ভাই এসেছেন, বাড়িটা যেন জমজমাট হয়ে উঠেছে, তাই নয় ?

—হ্যাঁ।

—আম্মা! তোমার চোখ দেখি শুকায় না।

—তোর ছেলে আছে, বুঝিস না কেন কাঁদি ?

—ভাবীকে দেখ না, সে তবু বুক বেঁধে থাকে।

—আর কাঁদব না !

—আম্মা ! মক্কায় কি যে সে যেতে পারে ? আর দিল্লীর কোন আমীরের সঙ্গে ?

রোকেয়া নিশ্বাস ফেলে বলল, ওর কাছে তো আমরা সবাই যে-সে। তবে আমাদের দরের মানুষ হত তো কাছে থাকত, দেখতে পেতাম।

নিসারের দলিজে গ্রামের পাঁচজন এ সব কথাই বলল। তিতু তার গ্রামের নাম উজ্জ্বল করেছে। এই গ্রামের পথে মাঠে খেলে-পিটে যে ছেলে বড় হল, সে-ই আজ দিল্লীর কোন্ আমীরের সঙ্গে চলেছে মক্কা। এতে এ অঞ্চলের সকলের গর্বটা বেড়ে গেল।

রাতের নিভৃতে তিতু মায়মুনাকে বলল, তুমি তো কিছু বললে না ?

—আমি কি বলব ?

—সবাই কত কথা বলছে।

—আমি তো কোন দিন কোন কথায় 'না' বলিনি ? কোন কাজে 'না' বলিনি ?

—তোমার দুঃখ হচ্ছে ?

একটু চুপ করে থাকল মায়মুনা। তারপর বলল, হলেই বা কি করার ? তবে মক্কা তো অনেক দূর। যেতে আসতে অনেক সময় লেগে যায় বলে শুনেছি। এঁদের বয়স হয়েছে, আর কি দেখা হবে ?

—নিশ্চয় হবে। মানুষ যাচ্ছে না ? তারা কি ফিরছে না ঘরে ? দেখা কেন হবে না ?

—কলকাতা গেলে, ভাবলাম সে কত দূর। চাকরিতে গেলে, ভাবলাম সে কত দূর। আর কলকাতা না হরিণবাড়ির জেলখানা ! সে যে কেমন তা ভাবতেই পারিনি। কত ভেবে মরেছি।

—খুব ভাবতে, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—হাতে ও কোন্ চুড়ি ?

—রেশমী চুড়ি। হাসিমা পরিয়ে দিল।

—নলু এখানেই তো আছে।

—তোমার দাংগার সময় থেকেই।

—সেখানে সব ফেলে এলো ?

—ওর শ্বশুর দেখছে।

—তুমি বাপের বাড়ি যাওনি ?

—কোথাও যাইনি। কেন যাব ?

—বাঃ, মানুষ যায় না ?

—না। আম্মা তাহলে কাঁদত আরো।

—জওহার আব্বাজানকে সাহায্য করে ?

—খুব। ছেলেরা খুব দেখে সব।

—যাক। তবু ভাল।

—তুমি আম্মার কাছে কাছে একটু থেকো। একটু কথা বোল। সে বড় হেদিয়ে মরে।

—বলব।

—এই কাঁথাটা আম্মা পেড়ে দিয়েছিল, আমি করেছি, কেমন, ভাল হয়নি ?

—চমৎকার হয়েছে।

—ব্যারাকপুরে কি যেন হল? খুব গুলি চলল, খুব মানুষ মরল? ও বাবা! যত কাঁদে আম্মা, তত কাঁদি আমি। আমরা কি জানি কোথা ব্যারাকপুর। শেষে জওহার সব শুনে এলো নারকেলবেড়িয়া থেকে। এসে বলল, আব্বাজানের কিছু হয়নি। তখন আমরা মাথায় জল দিই, ভাত খাই।

কথা বলতে বলতেই মায়মুনা ঘুমিয়ে পড়ে। তিতুর ঘুম আসে না। ব্যারাকপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল। জেল জায়গাটা খুবই অদ্ভুত। সেখানে কত খবরই আসে।

জলপথে বর্মা যাবে না বলে ওরা বিদ্রোহ করে। পুরো সাত-চল্লিশ নম্বর রেজিমেণ্ট। বিদ্রোহ দমন করতে স্বয়ং কমাণ্ডার ইন্ চিফ এসেছিল।

এ তো খুব স্পর্ধা বর্মার রাজার। ইংরেজের রাজত্ব বাড়তে বাড়তে বর্মার সীমানার কাছে চলে এসেছে। তোমরা নিজেদের স্বাধীনতা বিপন্ন বলে ভয় পাচ্ছ। তা বলে আসাম অধিকার করবে, চট্টগ্রামের কাছে দ্বীপ দখল নিয়ে বাংলা আক্রমণের হুমকি দেবে?

ইংরেজের দরকার বর্মার শালকাঠ, হাতির দাঁত, মোটা চাল, চুণি, মরকত, পান্না, গোমেদ, এ সব মণিমাণিক্য। বর্মার আছে রেশম, বনজ সম্পদ, গালাশিল্প, এ সব তো চাই।

কিন্তু রেমুর যুদ্ধে ইংরেজ হেরে গেছে। আর বর্মার সেনাপতি বান্দুলা এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

তাতেই সাতচল্লিশ নম্বর রেজিমেণ্ট বলেছিল, কোম্পানীর রাজ্য-সীমা বাড়াতে আমরা কালাপানি কেন পেরোব? আমরা তো পাঁচ টাকা মাইনের সেপাই।

কেন আমরা মরতে যাব?

কেন আমাদের বেতন অল্প?

কেন ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের মাইনের এত তফাৎ?

আজ সেরিঙ্গাপাটন, কাল লসোয়ারি, পরশু নেপাল, আমরা কত জায়গায় লড়তে যাব?

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশাল ফৌজ তো ভারতের সিপাহী নিয়ে। সিপাহীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

কমাণ্ডার ইন্ চিফ ওদের ওপর কামান দাগে। কতজন মরে, কতজন জখম হয়ে গঙ্গার দিকে দৌড়য়, কতজনকে ব্যারাকপুরে ফাঁসি দেওয়া হয় আর কতজনের নাম সেনা-রেজিস্টার থেকে মুছে ফেলা হয়, কে তার হিসেব রাখবে?

সবই শুনেছিল তিতু। তবু ওর মনে ছিল জিজ্ঞাসা।

—সিপাহীদের তো বন্দুক ছিল?

—তা তো থাকবেই।

—ওরা লড়ল না—মার খেল এমন করে!

—আপনি বুঝছেন না ভাই। বন্দুক বনাম বন্দুক হলে তো লড়বে। কামান দেগে উড়িয়ে দিলে ওরা বন্দুক নিয়ে লড়বে কেমন করে?

—তা তো সত্যি।

—ওদের সবচেয়ে বড় সাহেব গিয়েছিল তো। সে যে কামান দাগতে বলছে, সে কামানে সত্যিকারের গোলা আছে বলেও তো সিপাহীরা ভাবতে পারেনি।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই তিতু ঘুমিয়ে পড়ে। ভেতর ভেতর ও পাল্টে যাচ্ছে কেবলই। বাইরে গিয়ে, নানা ধাক্কা খেয়ে ওর মনটা ঘর সংসারের গণ্ডীটা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে। সেই জন্যেই ওর মনে কত রকম চিন্তা আসে।

পরদিন রোকেয়া দুপুরে খাঞ্চা সাজিয়ে দিল নানা ব্যঞ্জনে।

—আম্মা! এত রেঁধেছ কেন?

—সব আমি রাঁধিনি। পাড়াপড়শি এ-ও-সে দিয়ে যাচ্ছে তরকারি।

—এ মাছ তো তোমার হাতের রান্না।

—হ্যাঁ। তুই ভালবাসিস, করলাম। নয়তো আজকাল আমি রসুই করি না। হ্যাঁ রে, আবার কোথাও যাবি না তো? রওনা হওয়া অবধি এখানেই থাকবি তো?

—কেন বল তো?

—সাধ যায় কাছে বসিয়ে তোকে সাধ মিটিয়ে খাওয়াই। তাই শুধাচ্ছি।

—খাওয়াও না।

নিসার বলল, মনিব তোকে ডেকেছিল।

—দেখি!

—আবার সেখানেও খাবি? এই যে বললি যাবি না। এখানে থাকবি।

—না! আমি আর কাজ করব না। কিন্তু কেমন হালচাল দেখে বুঝে আসি। সে মানুষ ভিতু, মারদাংগাকে ভয় পায়। কিন্তু লোকটা খারাপ নয়। যদি দেখি তার দরকার, তাহলে হাফিজ, বিশু, হায়দার, করিম, আমার বন্ধুদের দু-একজনকে সেখানে ঢুকিয়ে দিয়ে যাব। লাঠি ধরতে তো জানে। তীর চালায়, আর এখনো এ কাজে পয়সা আছে।

নিসার নিশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ। এখন তো পয়সার দিন এসে গেল। ক্রমে দেখবে কড়ি উঠে যাবে। আর কুঠিয়ালের গোমস্তা নায়েব এরাই সর্বনাশ করছে। সব মহাজনী কারবার করতে লেগেছে। দেশঘরের রীতনিয়ম রাখছে না।

—কি রকম?

—ধারকার্জ তো নেই দেশে, আছে ধান বাড়ি।

—যেমন দিচ্ছি তেমন ফিরত নিই না। খাওয়া ধানে একমণে মণের ওপর দশসের ফেরত নিই। বীজধানে একমণে দেড়মণ নিই। এমন আগে নিতাম না। মন্বন্তরের পর থেকে এমন নিয়ম চালু হল।

—দাদী তাই বলে গেছে।

—আম্মাজানের দিমাকটা খুব ভাল ছিল তো। তার মাথায় সব লেখা থাকত। অমুখ দিনে এত ধান বের করলি, তমুক সময়ে গোহাল বাড়াতে তিন কড়ি দিলি, এমন সে বলতে পারত। কিছু ভুলত না।

—খুব কিস্সা কথা জানত। কত কথা বলত।

—তা এখন তো কুঠি যত জায়গায়, সেখানকার গোমস্তা নায়েব ভাদ্রমাসে ডেকে ডেকে ধান বাড়ি দিচ্ছে আর তারপর রায়তকে দেনদার করে ফেলছে। তা বাদে জমিতে দাগ দিয়ে নীল চাষ করাচ্ছে।

—এমন করতে পারে ?

—কুঠিয়াল এর মধ্যে সে জমি চাকর-বেয়ারা-পাইকের বেনামে নিয়ে নিচ্ছে।

—জমিদার জানে না ?

—কোথা জমিদার ? তারা নেই। আর পত্তনিদারদের পত্তনি দিয়ে দিচ্ছে তালুকের পর তালুক। হাটবেড়িয়া তো এই করে চলে গেল। খুব দুর্যোগ লেগেছে বটে। এমন বিপদ আগে ছিল না।

—এ কিছুকালের মধ্যে হল ?

—নয়তো কি ?

—দেখি, একবার ভূদেববাবুর কাছে যাই।

ভূদেব পালচৌধুরী তিতুকে দেখে খুব খুশি হল। সে মক্কা যাচ্ছে জেনেও সে খুশি। বলল, তুমি তো তাজুদ্দীনদের মত নও। পাঁচ জায়গা দেখেছ। হালচাল বোঝো। রামচাঁদ খুব শত্রুতা করছে, লেঠেল ভাঙাচ্ছে। দেখ! এখন ওদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যহ দাঙ্গা বাধতে পারে এমনই হাল।

—কেন ?

—ওদের হাতে বেনামী জমি। কুঠিয়াল জমি নেবে এমন আইন নেই। তাতেই বেনাম বে-এলাকা জমিতে নীল চাষ চলছে। কোন দিন আইন হাতে পেলে আর তো ধান দেখব না, শুধু নীল দেখব !

—তাই দাঁড়াল।

তিতুর প্রস্তাব জেনে ভূদেব পালচৌধুরী খুশিই হল। বলল, তোমার লোক যখন, জান দিয়ে দেখবে।

এ ভাবেই তিতু তার সঙ্গীদের ব্যবস্থা করে গেল। আর বিশু-

দের বলল, আমাদের ঘরের দিকে খানিক নজর রাখিস। আব্বাজান আম্মা, সব বয়স হয়েছে অনেক।

বন্ধু ওরা, সমানে সমানে কথা বলতে পারে। হাফিজ বলল, তুই কি থাকিস না কি? আমরা দেখি কি দেখি না চাচা চাচীকে জিগ্যেস করিস।

বিশু বলল, চাচী বলবে, তোরা আছিস, সে কাছে নেই। খবর নিয়ে গেলে মুখটা দেখি আর প্রাণটা জুড়ায়।

—তোর মেজ ছেলে আর ছোট ছেলে তোর ধারা ধরেছে। খুব দুর্দান্ত দুরন্ত। বড়টা ঠাণ্ডা।

হায়দার বলল, বেটাছেলে কি রকম হবে আবার? দুরন্ত হলেই ভাল।

তিতু বলল, আমার ভাগ্নে মাসুমটা খুব তেজী রুস্তম হয়েছে। ভয় ডর নেই।

—মামার ধাত নিয়েছে আর কি।

ওরা গাছতলায় বসল, গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেল। তারপর মুড়ি কিনে আনল গ্রাম থেকে, শক্ত গুড় ও পেঁয়াজ। গ্রামবাসীরা ওদের কুঠির পেয়াদা-টেয়াদা ভেবেছিল। হাতে হাতে কড়ি পেয়ে ওরা অবাক হয়ে যায়। একটি বুড়ো এগিয়ে এলো সাহস করে। লঙ্কা দিল এক মুঠো। নাতিকে বলল, জল নিয়ে আয়।

অনেক কথাই গল্প করল বুড়োটি। চতুর্দিকে মন্দ বাতাস লেগেছে, নইলে যে পুকুরের জল কখনো শুকায় না, তাও শুকোচ্ছে। বর্ষাকালে বেগুন চাষটা মার গেল। বর্ষাতি বেগুনে ঝুমঝুম করছে পোকা, আর পেঁচোর নজরে কাঁচা ছেলে কাঁচা পোয়াতি দু'ঘরে মরল। ধনুকের মত বেঁকে, মুখে গ্যাঁজলা তুলে। বীভৎস মৃত্যু। ধানটা উঠলে পীরের মাজারে যেতে হচ্ছে। খুব অনাচার চারদিকে।

অনেকদিন বাদে তিতুরা কয়েকজন বন্ধু এমন করে খানিক পথ হাঁটল, খানিক বসল।

তারপর একদিন তিতু সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে কলকাতার পথে —খুব। [illegible]কয়া মনে মনে বলল, যেমন জায়গায় আমাদের

মত লোক যেতে পারে না, সেখানে তুই যাচ্ছিস। এর পিছনে আল্লার কি বা ইচ্ছে আছে কি বলব? তুই ভাল হয়ে, ফিরে আয়। আর কিছু চাই না।

আমগাছটা জড়িয়ে ধরে কতক্ষণ চেয়ে থাকল রোকেয়া। না, তিতু জানে না ঘাড়টা ঘুরিয়ে চাইতে। অথচ চাইলেই ও মাকে দেখতে পেত।

॥ ছয় ॥

সৈয়দ আহম্মদকে দেখেই তিতু বুঝেছিল, এ খরসান কৃপাণ ধরা ধর্মযোদ্ধা। অনেক দিন ধরে কথা হয়েছিল তাঁর। সৈয়দ আহম্মদের ও ফরিদপুরের সরিয়তুল্লার।

—আমি আর শাহ ইসমাইল, প্রথমে শুরু করি ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন। পাঞ্জাবে আমার লড়াই শিখ রাজার বিরুদ্ধে। সে কেন কোম্পানীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছোট বড় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা কেড়ে নেবে?

—আপনি কলকাতায় এলেন যখন, আমি সবে জেলে গেছি। শুনেছিলাম সবই, দুর্ভাগ্য যে দেখা হয়নি।

—কি শুনেছ?

—রোহিলখণ্ডের রোহিলাদের নিয়ে আপনি যে পাটনা হয়ে কলকাতায় আসছিলেন! আচ্ছা, এ কথা কি সত্যি যে আপনি সে সময়ে একটা সরকার তৈরী করেন?

—করেছিলাম, সঙ্গে এত লোক জুটল যে সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার! পাটনায় বসালাম আমার খলিফা, সে টাকা তুলল কার-বারীদের কাছ থেকে। গরীবকে উৎপীড়ন করি নি। বড়লোকের কাছে নিয়েছি। এমন ব্যবস্থা আগাগোড়া করতে হয়েছিল।

—এরপর কি করবেন?

—হিন্দুস্তানে ফিরব। কলকাতা, পাটনা, গোয়ালিয়র, বেরিলি, দিকে দিকে যাব, তারপর পাঞ্জাব!

—সেখানে?

—বিদেশীকে উৎখাত করব। মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করতে হবে। মুসলিম যুবকদের নিয়ে আরো মুজাহিদ ফৌজ গড়ব। পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমে ঘাঁটি করে ইংরেজ তাড়াব।

—সেখানে কেন?

—সেখানে যে পাঠান উপজাতিরা আছে তারা খুবই স্বাধীনতা-প্রিয়, খুব লড়াকু।

—হিন্দুস্তানে আপনার মত কেমন প্রচার হচ্ছে?

সৈয়দ আহম্মদের তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি কোমল হল। তিনি বলতে থাকলেন, আমার কাজ তো শুরু হয়ে গেছে। কতজন আমাকে বলেছে যে তুমি বালির ওপর গমের বীজ ছিটাচ্ছ। মাটি হলে ফসল দেখতে পেতে। মানেটা বুঝলে তো? আমার ওয়াহাবী আদর্শ কেউ গ্রহণ করবে না।

—তা কেমন করে হবে? আমরা তো গ্রহণ করেছি। আমরা আপনার সাগির্দ।

—গ্রহণ যদি করে থাক তাহলে আমার ইচ্ছা যে তোমরা তোমাদের স্বদেশে গিয়ে এর প্রচার কর। মুজাহিদ ফৌজ গঠন কর। লড়াই কর বিদেশীর বিরুদ্ধে।

—করব, লড়াই করব।

—তোমাদের ডাকে ধনী জমিদার, মোল্লা মৌলভী, যারা পীর-মুরিদি করে খায়, তারা সাড়া দেবে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে গরীব জোলা, চাষী, তাঁতী, ধুনারি, রংরেজি, এমন সব লোকরা আসবে। ওরাই তো আসে। আমাদের লড়াই সব রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সমাজের সব অন্যায়ের অত্যাচার তো ওরাই সহ্য করে, তাই ওরাই আসবে।

—নিশ্চয় আসবে।

—ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের যে যুদ্ধ, তা জেহাদ, ধর্মযুদ্ধ। মারাঠা রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি। বিলায়েত আলি আর এনায়েত আলি হিন্দুস্তানে জায়গায় জায়গায় কেন্দ্র স্থাপন করছে। বিহার, বাংলা, মধ্যভারত, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ—সব জায়গায় ওয়াহাবী মত ছড়াচ্ছে, আরো ছড়াবে।

—আপনি কি বলতে চান, খুব সোজা কথায় বলুন। আমরা তো আপনার মত জ্ঞানী নই।

—দেখ, এই কথাটি সকল ওয়াহাবী পবিত্র বাণীরূপে মনে রাখবে।

—কি কথা?

—ইসলাম আসলে শান্তির ধর্ম। এক ধর্মের লোক নয় বলে অমুসলমানের সঙ্গে যে অহেতুক ঝগড়াবিবাদ করবে, সে আল্লা এবং আল্লার রসুলের রোষভাজন হবে। আল্লার রসুল বলেছেন, কোন শক্তিশালী অমুসলমান, যদি কোন দুর্বল অমুসলমানের ওপর অন্যায় অবিচার করে, মুসলমানরা সেই দুর্বল লোকটিকে অবশ্য যেন সাহায্য করে।

—মনে রাখব, কথাটি খুব বড় কথা।

—এ কথা মনে না রাখলে হিন্দুস্তানে সবাই বলবে ওয়াহাবীরা অমুসলমান বিরোধী।

—না। তেমন কাজ হবে না। তবে আমরা, একটা প্রশ্ন, কেন আমরা গরীব অমুসলমানদের মধ্যেও প্রচার করব না? গরীব গরীবই থাকে, ধনী থাকে ধনী। গরীব আর ধনীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান নেই।

—এ কথা সত্যি, খুব সত্যি। কিন্তু আগে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে কাজ করা বেশি দরকার।

—আরো বলুন!

—ইসলামীয় আদর্শ আজ বহু সংস্কারে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তাতেই গরীব মুসলমান নানা ভয়ের বাঁধনে প্রকৃত ধর্ম চিনতে পারছেন না! কোম্পানী সরকারী তামাম হিন্দুস্তানকে শত্রুর দেশ করে ফেলেছে। একই সঙ্গে সমাজকে প্রকৃত ধর্মপথ চেনাও, বিদেশীকে হটাও এবং সেজন্য মুজাহিদ ফৌজ গঠন কর।

—কি নিয়ে লড়ব? কোন্ হাতিয়ার?

—যা করছ তাই যে সত্য কাজ, এই কথা জানাই হল শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। হাতে কি রাখবে? তোমার দেশে যা সহজে পাবে তাই রাখবে।

সরিয়তুল্লা বলল, আমি ফিরে যাব আর ফরিদপুরে গড়ব মুজাহিদ ফৌজ। আমার পরে আমার ছেলে দুদু মিঞা সে কাজ করবে।

তিতু বলল, আমি কাজ করব হায়দারপুর, নারকেলবেড়িয়া এমন সব অঞ্চলে।

সরিয়ত বলল, এই তো তুতুকে বলব! আমি ফিরব, সে আসবে মক্কা। আর যেখানেই জেহাদ হবে সেখানেই আসবে ঢাকা, ফরিদ-পুর, ময়মনসিং, এমন সব জায়গার লোকেরা।

সৈয়দ আহম্মদ বললেন, আমরা সবাই মুজাহিদ। আর ওয়াহাবী মতে যে কাজ করবে সে-ই হবে মুজাহিদ।

—এ ধর্মমতের মূল কথা কি?

—ঈশ্বরের ক্ষমতা কোন মানুষের নাই! জিন—পরী—প্রেত—ভূত—পীর—পয়গম্বর, এদের কোন ক্ষমতা নাই। দরগা-মসজিদ তৈরি কোর না। ফয়তার (শ্রাদ্ধের) কোন দরকার নেই। টাকা ধার দিয়ে সুদ নেবে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাদ্যভাণ্ড, জাঁকজমক একেবারে নিষিদ্ধ।

তিতু বুঝল, এই হল যুদ্ধের ঘোষণা। সে বলল, এর প্রতি শর্তে প্রবল বাধা আসবে।

—নিশ্চয়। অমুসলমান ও মুসলমান সমাজে সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশ, পীর-মুরিদের, মোল্লাদের ভীষণ প্রতাপ।

—তারা আমাদের বাধা দেবে।

—দিক। বহু মুসলমান তাদের অস্বীকার করার পরেও বেঁচে আছে দেখলে পরে গরীব অমুসলমান বুকে বল পাবে। বুকে সাহস আসবে তাদের।

—দরগা-মসজিদ তৈরী করতে, কবর বাঁধাতে, ফয়তা ও সকল কাজে দাওয়াতে কম খরচ হয় না।

—তাতে বাধা পড়বে।

—টাকা ধার দিলে সুদ নেওয়া গোনাহ্।

—এ কথায় কোন্ মহাজন চটবে না?

—তারাও শত্রু হবে।

—ধান দিয়ে তা শোধ না দিলে তাতে সুদ ধরে গরীবের ভিটে-জমি নেওয়াও গোনাহ্?

—নিশ্চয়। এতে জমিদার চটবে।

—আমাদের দেশে নীলকরের জুলুম।

—ওরা তো আগে চটবে।

—অনেক শত্রু হবে।

—তুমি তো একা নও তিতু মীর। মুজাহিদ ভয় পায় না, কেননা তার অন্তরে আছে বিশ্বাসের আলো। আর মুজাহিদ একা নয়, কেননা প্রতি মুজাহিদ তার আপনজন।

তিতুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সে বলল, আমি পথ পেয়ে গেছি।

পথ পেয়ে গেল তিতু মীর। পরিবেশ ও অবস্থা তাকে অনেক দিন ধরে গড়ছিল। শৈশবে সে ভূতের ভয় দেখালে 'ভূত এনে দাও, দেখব' বলে কাঁদত। বালক তিতু বাঘ পুষতে চেয়েছিল। এতকাল পরে সে পেল নির্ভীক হবার মন্ত্র।

॥ সাত ॥

কে ওয়াহাবী, তা দেখে চিনবে।

এত দিন মুসলমানরা সকলের মত ধুতিও পরেছে, তিতু পরে তহবন্দ্। আধখানা ধুতির মাপের কাপড় দুই মুখ জুড়ে সেলাই করে, তাই পরে।

তহবন্দ্ পর, দাড়ি রাখ, মাথার মাঝখানটা কামাও চেহারা দেখেই যেন তোমাকে ওয়াহাবী বলে চেনা যায়। তিতুর নিজের ছেলেরা, ভাগ্নে মাসুম, ভাই নিহাল, শৈশবের বন্ধুরা, সবাই ফরাজী।

তিতুর গ্রাম থেকে আশপাশের দশ-বিশ ক্রোশ জুড়ে এখন সাড়া জেগেছে।

তিতু দলিজে বসে, সকলে আসে। আশপাশের গ্রামে গরীব মুসলমানই বেশি। ছোট ছোট চাষীরা আসে, আসে জোলারা।

সুদ নেওয়া গোনাহ্, পীর-মুরিদরা ক্ষমতাহীন, ধর্মের নামে ধার-কর্জ করে আড়ম্বর করা অর্থহীন, এ সব কথা ওদের মনে এনেছে আশ্চর্য সাড়া।

পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে কে খবর দিল, তাঁরই জমিদারির সর্পরাজপুরের জোলারা ফরাজী হয়েছে।

—বটে ?

—তাই হয়েছে।

—তারা কি করবে ? হিন্দুদের কাটবে ?

—তা হলে তো ভালই ছিল।

—তার চেয়েও ভয়ানক কিছু ?

—তেমন হলে পরে আমিই দৌড়ে যেতাম বাদুড়িয়া থানা। দারোগা তো আপনার ভক্ত। এরা যে বলছে, মুসলমান কখনো হিন্দুর সঙ্গে কেজে করবে না। বরঞ্চ, যদি কোন ধনী হিন্দু গরীব হিন্দুর ওপর অত্যাচার করে, তবে মুসলমানরা গরীবের পক্ষ নেবে।

—তা কেন হবে ? এমন কথা তো কেউ বলেনি কখনো ?

—আরো বলছে, ধার নিলে সুদ দেবো না। সুদ দেওয়া আর নেওয়া মহাপাপ।

—বাঃ! আমি ভাদ্র-আশ্বিনে খোরাকি ধান দেব আর নেবার কালে সুদ অনাদায়ে কিছু করতে পারব না? কে ওদের ক্ষ্যাপাচ্ছে? কোন পীর ফকির?

—না না, এরা তো পীর-মুরিদকে মানছে না। ফলে তারা ক্ষেপে গেছে ভীষণ।

—মানছে কাকে?

—তিতু মীরকে?

—হায়দারপুরের তিতু মীর?

—হ্যাঁ হুজুর।

—হবে না? তার তো বাড় বাড়বেই। বারোগাছিয়ার ভূদেব পাল ওর আস্পর্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে যে! মুসলমানকে লেঠেল রাখলে তাকে কি এত আস্পর্ধা দিতে হবে?

—এর পরেই শুনতে হবে ওরা কাছারির মাঙন দেবে না!

—সে তো জানাই যাবে। সামনে বাবার বাৎসরিক আসছে। কাছারির পাওনায় 'না' বললে দেখে নেব।

জোলারা এ কথা শুনে হায়দারপুরে গেল। আর্জি আছে তাদের।

—কি আর্জি?

—তুমিই এখন আমাদের সব। তা ওয়াহাবী যা যা দেবে না করবে না তার মধ্যে জমিদারের মাঙনটা ধরলে না কেন? এই যে জমিদার তার বাপের ফয়তা করবে, তা আমাদের দিতে হবে দশখানা গামছা। এত পারি? দশখানা গামছা বিকোলে দশ সের চাল তো হত।

তিতুর বন্ধু বিশু বলল, তোমরা যেমন? দশখানা বলেছে, দাও দশখানা।

তিতু বলল, কবে?

—এই তো, সাতদিনে।

—বরাবর এ ফয়তা হয়?

—বরাবর।

—কতগুলো দাও?

—পাঁচখানা।

—পাঁচটা গামছার সুতোয় দশটা গামছা বুনে দাও গে এবারের মত।

—এমন জুলুম সম্বৎসর চলে।

—মোজাহিদরা তৈরি হয়ে গেলেই সব বন্ধ হবে।

পীর-মুরিদরা ক্রোধান্ধ হয়ে তিতুর কাছে এলো। তাদের কথা আছে, সে সব কথা তিতু শুনুক।

—কি কথা?

—তুমি আমাদের পিছনে লেগেছ কেন?

—লাগিনি তো?

—তোমার এ কি ধর্ম? পীর-মুরিদকে মানবে না। রোগে দুঃখে তাবিজ মাতুলি নেবে না!

—হ্যাঁ, এ কথা আমি বলি। কেননা একমাত্র আল্লা বা আল্লার রসুল ছাড়া কারো, কোন মানুষের ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা নেই।

—মিথ্যে কথা!

—চুপ কর অবিশ্বাসী। আমি আবারও বলছি, একমাত্র আল্লা বা আল্লার রসুল, এঁদের ওপর বিশ্বাস রাখলেই হবে। আর কারো ওপর বিশ্বাস রাখার দরকার নেই। তুমি আর তোমাদের মত লোকরা কি মানুষের ভাল বা মন্দ করতে পারো, রক্ষা করতে পারো তাকে?

—নিশ্চয়।

হায়দারপুর গ্রাম কেন, কোথাও তো কেউ এমন করে কথা বলেনি পীরদের সঙ্গে। তিতুর কথা শুনতে সাতখানা গ্রামের মানুষ ভিড় করে এসেছিল।

তিতু বলেছিল, তোমাদের সম্মান রেখে এতক্ষণ সব কথা বলিনি। এখন সব বলছি। ওই যে বিশু, ওর বোনের অসুখে তোমরা এসেছ আর যা যা করতে বলেছ সবই ওরা করেছে—তাহলে সে বোন কেন

মরে গেল ? আর হাফিজের বাপের হালের বলদ মরল, জমিদার বক্রী খাজনার দায়ে জমি কেড়ে নিল, তখনও তার অবস্থা ফিরাবার জন্যে তাকে নানা পরামর্শ দিয়েছ। এমন দৃষ্টান্ত তোমাদের চারদিকে আছে। খোলা চোখে সাদা মনে বিচার করে দেখেছি। তোমাদের কেন, কোন মানুষের দ্বারা কারো ভাল-মন্দ হবার নয়।

পীর-মুরিদরা তিতুকে অভিশাপ দিয়েছিল। এমন অভিশাপ চন্দ্রপুরের রহমত শেখও দিয়েছিল। সে তেজারতিতে টাকা খাটায়। এখন সুদ নেওয়া গোনাহ্ হল যদি, তবে তার কারবার যে বন্ধ হয় ?

এ সব কথা চারদিকে ছড়াচ্ছিল। আর মন্ত্রের মত কাজ হচ্ছিল সাধারণ মানুষের মনে। চারদিক থেকে দলে দলে লোক আসছিল হায়দারপুরে। হাসিমা বলেছিল, বড় ভাই! নারকেলবেড়িয়া চলুন। সে গ্রাম এর চেয়ে বড়। মাসুমকে তো আপনি নিয়েই নিয়েছেন। সেখানে আমরা মস্ত দলিজ দেব, মাঠ আছে, ছেলেরা সব অতিথি-মেহ্‌মানকে রাখবে। লোক আসার তো অন্ত নেই।

নারকেলবেড়িয়াতে মাঠে মাসুম, তিতুর ছেলেরা, এমন সব তরুণদের হাফিজ, বিশু, এরা লাঠিখেলা শেখাতে পারে। যত লোক আসে তিতুকে দেখতে, তারা থাকতে পারে মাঠে ও গাছতলায়। নারকেলবেড়িয়ার বিস্তৃত বাঁশবন থেকে চমৎকার লাঠির বাঁশ মেলে। তিতু বলল, বাঁশ কেটে ওই মাঠে একটা মস্ত চালাঘর ওঠাবার বন্দোবস্ত কর। গৃহস্থবাড়িতে এত লোক এলে চলে না।

হাসিমা এ কথায় দুঃখ পায়। বড় ভাইয়ের কাছে দেশের মানুষ আসছে, এতে তো তার বাড়ির গর্ব বাড়ত। তিতু হাসে, তুই কি বড় হবি না হাসিমা ? অবুঝই থাকবি ?

নারকেলবেড়িয়ার মাঠে ওঠে বাঁশের মস্ত ঘর, তাতে বাঁশের মাচান্। সে মাচানে বসে তিতু। যতজন পারে মাচানে বসে। তারপর মাঠ আছে।

বাঁশের ঘর দেখে মাসুম বলে, ঘর যদি এমন সুন্দর হয় তাহলে তো আমরা বাঁশের কেল্লা বানাতে পারি।

তিতু বলে, যদি কখনো বানাই তো বাঁশেরই কেল্লা বানাবো। ইট কাঠ পাথর পাব কোথা? যা মিলে তাই ভাল।

এখানেই একদিন—তিতু মীর! তিতু মীর! বলে হেঁকেডেকে এক ফকির আসে। কত বয়স হয়েছে তার, চুল-দাড়ি সাদা। কিন্তু শরীর পাকানো মজবুত। তার সঙ্গে কয়েকটি লোক, একটি কিশোর বালক।

—চিনতে পারলে?

—না, চিনলাম না।

—মিসকিন শাহ, মুসিরৎ শাহ, মনে পড়ে?

—আপনি? বেঁচে আছেন!

—বেঁচে আছি মানে? দস্তুরমত মুজাহিদ হে। এখন আসছি ফরিদপুর থেকে।

—সরিয়তুল্লা!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো তার ছেলে।

—সরিয়তের ছেলে দুদু মিঞা?

—হ্যাঁ, এদের সঙ্গে মক্কা যাচ্ছে। এ খুব ভাল হল তিতু। আমি তো আমার সময়ের যাকে পেয়েছি তাকে বলছি পথ হয়েছে একটা। পুবদেশে খুব হবে। সেখানে গরিব মুসলমানের অন্ত নেই।

—আপনি কোথা চলেছেন?

—তোমার কাছেই এসেছি।

সবাই মিলে খুব জমায়েত হয়। দুদু এখনো কিশোর। কিন্তু সে মক্কা যাচ্ছে। বোম্বাই অবধি ওরা হেঁটেই যাবে। পথে পথে ওয়াহাবীদের খোঁজ পাবে। ফকির সাগ্রহে বলে, যুদ্ধ করতে শেখাও, যুদ্ধ।

—শিখছে।

—যুদ্ধ হবে?

—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জমিদার, মহাজন, পীর-মুরিদ, পুরুত-পূজারী আমাদেরকে পরধর্মবিদ্বেষী বলে প্রচার করছে। যদি যুদ্ধ হয়, তাদের কারণেই হবে। এখন এরা নতুন ধর্ম পেয়ে পাগল হয়ে

উঠেছে আনন্দে। চাষবাস, তাঁত, জাল, কোন কিছুতেই মন নেই। এমন অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। তবে এতে সকলের নজর পড়ছে। সবাই এ সব ব্যাপার লক্ষ্য করছে, নানা কথা বলছে।

ফকির বললেন, আমি তো আর কিছু পারব না। তবে শরা কবুল করাতে পারব। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে, তহবন্দ্ পরতে হবে, মানুষের আল্লার ক্ষমতা আছে মনে করা চলবে না, বাজনা-বাদ্য বাইরের অনুষ্ঠান বন্ধ, ফয়তার দরকার নেই, সুদ দেবে না, সুদ নেবে না! এখন শরা জারি করা ও কবুল করানো আমারও কাজ।

তিতু সকলের সঙ্গে ফকিরের পরিচয় করিয়ে দিল। কলকাতার বুকে যখন লাটসাহেব বাঘ শিকার করত, তখন এই সব ফকিররা আর সন্ন্যাসীরা সাহেবদের সঙ্গে লড়েছে। মজনু শাহের নাম শুনেছ? ইনি তাকে দেখেছেন। যশোর থেকে ফরিদপুরে হয়ে তবে আসছেন।

ফকির হাফিজ, বিশু এদের বললেন, যুদ্ধের গন্ধ হে, যেমন গন্ধ পেলাম তেমন এলাম।

হাফিজ বলল, বেশ শক্ত আছেন তো?

—আরে! যশোরে যেখানে ছিলাম, সেখানে মাছের রাজ্য। বনের মধু, জলের মাছ, যথেচ্ছ খেয়েছি হে। নৌকো বেয়ে ঘুরেছি সুন্দরবনে।

—এমন তাজা থাকলেন কি করে?

—মানুষের সঙ্গে ছিলাম। দুঃখী মানুষের মধ্যে থাকতাম, তাদের মনে সাহস দিতাম, ভালই ছিলাম।

এই ফকিরের জন্যে চন্দ্রপুরের কুমোররা নতুন হাঁড়ি-পাতিল, কলসি নিয়ে এলো। এরা হিন্দু। তিতুকে ওরা বলে গেল, কাছারি থেকে বলছে এরা হিন্দুদের মারবে কাটবে। কিন্তু অনেক হাঁড়ি পাতিল বিক্রি করছি আমরা। তোমার কাছে যত লোক আসছে সব তো হাঁড়ি পাতিল খোঁজে।

—কিনে নিচ্ছে তো?

—হ্যাঁ, কিনে নিচ্ছে। কড়ি না দিয়ে কেউ একটা সরাও নিচ্ছে না। তা দেখে আমরা বুঝেছি যে ওদের রটনা মিথ্যে। তোমরা আমাদের সঙ্গে কোন বিবাদ চাও না।

—না, কোন বিবাদ চাই না।

—আমরা ফকিরসাহেবকে এই হাঁড়ি-পাতিল ভেট করে গেলাম। দরকার পড়লে আমরা আসব।

মাসুম, তোরাব, জওহার, এদের মত ছেলেরা নিজের বুদ্ধিতে আরেকটি শর্ত যোগ করল শরা জারির সময়ে। তিতুকে বলে গেল, হাটে তোলা উঠানোর বিরুদ্ধে আমরা বলব।

তিতু কি বলবে? সে বলল, আমরা যখন তোদের বয়সী ছিলাম, সে চেষ্টা করছি। তোরা কর, আমি 'না' বলব না। কিন্তু ভেবে দেখ।

—কি ভাবব?

—যখন বাধা দিয়েছি, তখন কমেছে। আবার সে উপদ্রব জেঁকে বসেছে। তুমি আমি, আমাদের সাহসে সাহস পাবে হাটুরিয়া মানুষ, আমরা সরে এলে ভয়ে ভয়ে তোলা দেবে, এটা পথ নয়।

—ওদেরকে সাহস পেতে হবে।

—হ্যাঁ, ওদেরকে সাহস পেতে হবে।

—তা হয়ে যাবে। ওয়াহাবীরা যদি মনে জোর রেখে চলে, সবাই সাহস পাবে।

হাটে হাটে হাটুরিয়ারা তোলা দিতে চাইছে না, এ ব্যাপারটি জমিদারদের কানে গেল।

হাটুরিয়ারা বলল, কাছারির তোলা দিতে আমরা বাধ্য, কেন না জমিদারের জমিতে হাট বসে, এটা দেশাচার। কিন্তু ওই একটা হাট-তোলাই দেব। নায়েবের, গোমস্তার, মুহুরির, পাইকের, পুরুতের, সকলকে তোলা দেব না। ফরাজীরা কেন, আমরা কেউ দেব না।

পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় বিষম ক্রোধে বলল, বটে! এ সব দপদপা আমার জমিদারীতে চলতে দেব না। তিতু মীর ওয়াহাবী

ধর্ম আনল, সামিল করল মুসলমানদের, তা থেকে এ সব গণ্ডগোল বাধল।

নায়েব বলল, শুধু তো মুসলমানরা নয় হুজুর, কামার কুমোর চামার ডোমও যেন উল্‌সে উঠেছে।

—ছোট জাত! ছোট জাত।

মুসলমানরাই কি খুশি আছে? রহমত শেখের মত মহাজন, মকবুল চৌধুরীর মত জমিদার, পীর-মুরিদের দল, সবাই তিতু মীরের ওপর ক্ষেপে গেছে। তারা বলছে, ওয়াহাবীদের দর্পচূর্ণ না করলে সমূহ সর্বনাশ।

—কিসের সর্বনাশ? আমি কি মরে গেছি না আমার লেঠেল পাইক নেই?

—খাজনাই কি পাবেন হুজুর? চাষবাস বা অন্য কাজে তো এদের মন দেখি না।

—মন কি আর আসবে, আনাতে হবে। ওয়াহাবী হয়েছে, দাড়ি রাখছে।

—কাছা দিচ্ছে না। ফেরতা দিয়ে কাপড় পরছে।

—একে একে দেখছি। নাও, ঢেঁড়া দিয়ে জানান দাও যে আমার জমিদারীর মধ্যে যারা ওয়াহাবী হয়েছে, দাড়ি রেখেছে, তারা মাথা পিছু আড়াই টাকা করে খাজনা দাও। যাও, লেঠেল-বর্শেল নিয়ে পুঁড়া থেকে খাজনা তোল।

পুঁড়া গ্রামে যারা তিতুর শিষ্য, তারা তিতুকে এ কথা জানাবার সময়ই পায়নি। ফলে পুঁড়াতে খাজনা নির্বিঘ্নে আদায় হল। হয় খাজনা দাও, নয় গ্রাম ছেড়ে চলে যাও, এমন হুমকি অমান্য করা কঠিন ছিল।

এ কথা শুনে তিতু রাগে জ্বলে উঠল। সে বলল, কারো অনিষ্ট করিনি, যে-যার মতে ধর্মাচরণ করছি, তাতে বাধা দেয় জমিদার? কেউ খাজনা বন্ধ করেছে? বাকি রেখে পালিয়েছে? এ বরদাস্ত করা চলে না।

বহু কাল পরে রোকেয়া ছেলেকে ডাকল। বলল, তুই তো

বুড়ী মায়ের কথাটা শুনবি না বাবা। যত পীর-মুরিদ তারা তো শাসাচ্ছে যে জমিদাররা একজোট হয়ে তোর ওপর কোন চোট আনবে।

—কি করতে বল? পালাব আমি, তাই বল?

—পালাতে বলি না। পালাবার লোক তুই নোস। আর তুই সরে গেলে গরিব কার উপর ভরসা করবে?

—তবে কি বল?

—সাবধানে থাকিস।

—সাবধানে। এ তো জেহাদ মা।

—জানি, এও জানি যে জেহাদে আমি আমার ছেলেকে দিয়েছি। মায়মুনার মুখের দিকে চেয়ে দেখ। আমি, মায়মুনা, আমরা তো দেশবিদেশ যাইনি, অত কথা জানি না। আমরা শুধু তোকে জানি। তুই সাবধানে থাকিস।

—থাকব।

আর মায়মুনাকে তিতু যখন বলল, তুমি কিছু বলবে না?

মায়মুনা তার বেদনাবিদ্ধ কালো ও গভীর চোখ তুলে স্বামীর দিকে চাইল। তারপর বলল, কিছুই বলব না। আমাকে তুমি অনেক মান দিলে, গৌরব দিলে, তোমারই বিবি আমি, এ আমার গৌরব। আমিও তোমাকে আমার তিন ছেলে, তিন মুজাহিদ দিয়েছি। কিছুই বলব না। এমনি করেই এর-তার মুখে তোমার কথা শুনব। ঘর-সংসার, জওহারের দাদী আর দাদার সেবাযত্ন করব। আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।

—কখনো তো ভাবিনি মায়মুনা। তোমাকে ভাল কাপড়, ভাল গয়না পরাতে পারিনি।

—কি হবে? তুমি আছ, ছেলেরা আছে, তাতেই আমি সেজে থাকি।

হাসিমা ছাড়া কেউই পারে না তিতুকে ভাল ভাবে সহজে কথা বলতে। মায়মুনা বলল, এখানে থাকলে ওদের সঙ্গে বাইরেই খাও। হাসিমা তো তবু তোমাকে জোর করে, ধরে খাওয়ায়।

—খুব জোর করে। ওর কথা না শুনলে কাঁদতে বসে পা ছড়িয়ে।

হায়দারপুর থেকে যাবার সময়ে তিতু রোকেয়াকে কথা দিয়ে গেল যে সে সাবধানে থাকবে।

সে মুজাহিদদের পাঠিয়ে দিল পুঁড়া জমিদারীর অন্তর্গত ওয়াহাবী প্রধান গ্রামে গ্রামে। কোন কারণেই দাড়ি রাখার জন্য খাজনা দেবে না।

সর্পরাজপুরেও ঢেঁড়া পড়েছিল। কাছারিতে গিয়ে খাজনা দিয়ে এসো। জমিদারের হুকুম।

সর্পরাজপুর থেকে কেউই খাজনা দিতে গেল না। কৃষ্ণদেব বুঝল যে ওরা আসবে না।

তখনই সে তার কর্মচারী মুচিরাম ও একজন বরকন্দাজকে পাঠাল। সর্পরাজপুরে মসজিদে তিতু তার সঙ্গীদের সঙ্গে নমাজ পড়ছিল। মুচিরাম মসজিদের সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে জানাল, তোমরা দাড়িয় খাজনা দাওনি, জমিদার তোমাদের তলব করেছে। এখনি চল।

তিতু নমাজ ছেড়ে উঠে এলো। বলল, নমাজ করছে, ছেড়ে উঠে যাবে?

বরকন্দাজ লাঠি ঠুকে বলল, হ্যাঁ, তাই যাবে। জমিদার ডাকছে তা হতে কি নমাজ বড়?

তিতু ঝুঁকে পড়ে বরকন্দাজের ঘাড় ধরে ঝুলিয়ে শূন্যে তুলে ধরে আস্তে বলল, অনেক, অনেক বড়।

তারপর বরকন্দাজকে ফেলে দিল ছুঁড়ে। বরকন্দাজকে এর আগে কখনো কেউ শূন্যে ঝোলায়নি, ছুঁড়ে ফেলেনি। সে যে জমিদারের বরকন্দাজ, সেই কারণেই প্রজারা তাকে ভয় করেছে।

প্রজারা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, যাও যাও, পালাও।

বরকন্দাজ পালাল। ততক্ষণে মুচিরাম দৌড়েছে পুঁড়াতে। কোথায় পুঁড়া, কোথায় সর্পরাজপুর। যেতে আসতে অনেক সময় যাবে।

তিতু বলল, আমরা এখানেই থাকব। এখানেই থাকব, অপেক্ষা করব, ওরা আবার আসবে।

কৃষ্ণদেব পুরো ব্যাপারটাই মুসলমানদের ধর্মের গোঁড়ামি বলে ধরে নিয়েছে। মুসলমানরা তার চোখে অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং নগণ্য। সে একে জমিদার, তায় হিন্দু। তার জমিদারী রক্ত গরম হল, সামান্য চাষার ছেলে তিতু মীর তার বরকন্দাজকে অপমান করেছে বলে। সে অপমানের সাক্ষী অন্য জোলা, চাষী এমন সব লোকেরা।

তার হিন্দু রক্ত গরম হল, মুসলমানের কাছে আমার অপমান হল? মুসলমানের কাছে?

তখনই সে চারজন বরকন্দাজকে পাঠাল। তিতু মীর ওদের নেতা। তাকে ধরে আনো। সে শাস্তি পাক আগে।

বরকন্দাজরা আসার সময়ে নিজেরা কথাবার্তা কইতে লাগল।

—তিতুর নাম কে না শুনেছে?

—সে যখন এখানে থাকত, তখনি হাটতোলা তুলতে দেয়নি সহজে। তখনও সে হেম্মতদার।

—অমন লাঠি ঘোরাতে কেউ পারেনি।

—আর চেহারা যেন রাজার মতন।

—ভয়-ডর জানে না।

—ভাই রে! এমন লোকের সঙ্গে আমরা পারব?

—না পারলেও পারতে হবে। মনিব পাঠাচ্ছে যখন।

—যেয়ে না হয়, বেশ গুছিয়ে কথাটা বলব।

—হ্যাঁ। রামু একেবারে তেড়ে-মেড়ে গিয়েছিল।

—যদি মারে?

—তবে মরবে।

—না ভাই! মরতে আমার ভয় করে। আমি মরলেই বউ বাপের বাড়ি চলে যাবে আর কাকার ছেলেরা সর্বস্ব গ্রাস করবে। আমি মরতে পারব না।

—নাও, মরণ বাঁচন বিধির লেখন। এখন চল দেখি। কপালে যে কি আছে তা কে জানে?

বরকন্দাজরা এ ভাবে কথা বলতে বলতে সর্পরাজপুরে ঢোকে 'তিতু মীর! কাছারিতে—' বলতে বলতে তারা থেমে যায়।

অন্তত পঞ্চাশজন লোক লাঠি হাতে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কথা বলে না। চেয়ে থাকে।

বরকন্দাজদের মনের জোর উবে যায়। তারা পালায়।

এ ঘটনায় ভীষণ উৎসাহিত হয় তিতুর অনুগামীরা, মুসলমানরা তো বটেই, গরিব হিন্দুরাও উৎসাহিত হয়। দেখ। মারেনি, এগোয়নি, শুধু একজোটে দাঁড়িয়েছিল। তাতেই বরকন্দাজরা এমন ভয় পেয়ে পালাল! বরকন্দাজ যে আমাদের দেখে ভয় পায় তা তো আগে জানিনি। আমরাই ওদের ভয় পেয়েছি, সেটাই নিয়ম হয়ে গিয়েছিল।

তিতু বলল, ভয় করার সময় এত কাল ছিল। এখন ভয় ভাঙবার সময় এসেছে।

—যাক। বরকন্দাজের জুলুম খানিক কমবে।

কৃষ্ণদেব রায় মরিয়া হয়ে উঠল। এখন যদি সর্পরাজপুরে তার হারানো সম্মান আবার না ফিরানো যায় তাহলে সমূহ সর্বনাশ। প্রজারা ভুয়ো দিচ্ছে। ছোট জাত ও মুসলমানদের মাথা উঁচু হচ্ছে। অন্য জমিদাররাও তাকে ক্ষমা করবে না। জমিদারদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

কৃষ্ণদেব আশপাশের জমিদার ও নীলকরদের কাছে লেঠেল চাইল। সকলকে সে টাকা দেবে, কাপড় দেবে নতুন। এক দমকায় হয়তো বা হাজার টাকাই বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এ টাকা বের না করলে মান থাকে না।

কৃষ্ণদেব নিজেই তিন-চারশো লেঠেল নিয়ে নিজের জমিদারী সর্পরাজপুরে হানা দেয়। প্রজাদের ঘরবাড়ি লুট করে। জ্বালিয়ে দেয় মসজিদ। তারপরেই কৃষ্ণদেব রায় পালায়।

এ অঞ্চলের নিকটতম থানা বাদুড়িয়া। কৃষ্ণদেবের নায়েব সেখানে নালিশ জানাল, তিতু মীরের লোকরা আমাদের বরকন্দাজদের কয়েদ করে রেখেছে।

সর্পরাজপুরের লোকেরা জানাল, জমিদারের লোকেরা আমাদের ঘরবাড়ি লুট করেছে, মসজিদ জ্বালিয়েছে।

বাদুড়িয়া থেকে সব খবর গেল বসিরহাট থানায়। আর একই সময়ে কৃষ্ণদেব রায় হাজির হল বারাসতে। সেখানে সে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে বলল, শুনতে পাচ্ছি, আমার জমিদারীতে ভীষণ গোলমাল হয়েছে। আমি তো কিছুই জানি না। আমি বহু দিন বাইরে ছিলাম।

প্রশাসনের চাকা ঘুরতে থাকল। জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে বসিরহাট থানার দারোগা এলো সর্পরাজপুরে। এই দারোগা রামরাম চক্রবর্তী গ্রামটি দেখল, পুঁড়োর কাছারিতে বসে জলযোগ করল, তারপর রিপোর্টে জানাল, তিতু মীরের লোকরা মসজিদ জ্বালিয়েছে জমিদারকে ফাঁসাবার জন্য। জমিদারের লোকেরা সেখানে গিয়েছিল বটে, তবে কোন অত্যাচারই করেনি তারা।

দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণে দু'পক্ষকেই অভিযুক্ত করে দেয় দারোগা। বারাসতে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে কেস হয়। ওয়াহাবীরা বলল, দাঙ্গাহাঙ্গামার আঠারো দিন বাদে জমিদারের নায়েব বাদুড়িয়া গেল। এটা তো সাজানো মামলা। দারোগা কৃষ্ণদেবের কাছে ভালমত ঘুষ খেয়েছে, সাক্ষী ডাকা হোক।

ম্যাজিস্ট্রেট বুঝল, এ মামলা দাঁড়াবে না। সে দু'পক্ষকেই শান্তি রক্ষা করে চলতে বলে খালাস দিল।

তিতু সব কথা শুনে বলল, জমিদাররা শান্তিরক্ষা করবে? ওদের হাতে আছে হপ্তম আইন। তার জোরে আমাদের ওপর জুলুম চালাবে। ম্যাজিস্ট্রেট জানে যে মামলা চললে জমিদার বাঁচে না। সে দোষী সাব্যস্ত হয়। তাতেই ছেড়ে দিল।

মাসুম বলল, কোম্পানী সরকার জুলুম চালাবার জন্যে জমিদারকে হপ্তম আইন দিয়েছে। আর পঞ্চম আইনটা দিয়েছে নীলকরদের। দাদন নিয়ে নীল না চষেছ তো নিয়ে যেয়ে গারদে পুরব, শ্যামচাঁদ চালাব।

মাসুমের বাবা বলল, ওয়াহাবী হয়েছি, মুখ খারাপ করতে নেই।

তবু বলতে ইচ্ছে করে একটা কথা। কোম্পানী সরকারের দুই বিবি। একটা হল জমিদার, আরেকটা হল কুঠেল সাহেবরা। কোম্পানী কোন বিবিকেই চটাতে পারে না। যার দুই বিবি থাকে সে একে ঝাপটা, ওরে নলক দেয়। কোম্পানী একে এক আইন দিল, ওকে আরেকটা। বাপরে নীলের গুঁতো। জমিদারে কুঠেলে কথা হয়ে যাচ্ছে। রায়ত কিছু জানে না। সে দুটো ধান বুনবে, পেটে খাবে, জমিদারকে দেবে। তার গোমস্তারা পেয়াদা নিয়ে গলায় নিয়ে দাদন ঠুসে দিচ্ছে আর ভাল ভাল জমিতে দাগ মেরে নীল চষাচ্ছে।

—জমিদাররা মেনে নিচ্ছে?

—তাদের কি? খাজনা পেলেই হল। দেখতে পাচ্ছে যে রায়তদের রসা জমিতে দাগ পড়চে, শুখো জমিতে কতটা বা ধান হয়? তবু সে খাজনা বাড়াচ্ছে তো বাড়াচ্ছেই। কুঠেলে আর জমিদারে দেশে আগুন জ্বেলে দেশটার ফয়তা করে ছাড়ল।

১৭৯৩ সালে জমিদারদের বাংলার মাটিতে চিরস্থায়ী করে দেয় ইংরেজ, আর জমিদারদের আরো সুবিধে করে দেবার জন্যে করে দেয় কুখ্যাত হপ্তম আইন। এর বলে বলীয়ান হয়ে কৃষ্ণদেব এবার ওয়াহাবী বেছে বেছে তাদের ওপর জুলুম শুরু করল।

অনেক পরে সার্ভেয়ার অফ রেভিনিউ কলভিন সাহেব এ বিষয়ে এক রিপোর্ট পেশ করে। তাতে সে লিখেছিল, সমগ্র ঘটনাটির জন্য কৃষ্ণদেব রায় অসম্ভব রকম দায়ী। খুবই দুঃখের কথা যে লোকটাকে শাস্তি দেয় এমন কোন প্রশাসনিক অধিকার এক্তিয়ার তার নেই।

এ রিপোর্ট পড়ে সরকার তরফ থেকে কমিশনারকে লেখা হয়, কৃষ্ণদেব রায় হচ্ছে সেই জমিদার যার অন্যায় জুলুম ও জরিমানা আদায়ের ফলে রায়তরা বিদ্রোহী হয়। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে বল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

কৃষ্ণদেব রায় বুঝেছিল যে গ্রামের গরিব প্রজারা মামলা মোকদ্দমাকে বড় ভয় পায়। ওয়াহাবীদের বেছে বেছে সে বাকি

খাজনার দায়ে কাছারিতে আনতে থাকে। মিথ্যে মামলায় অনেককে জড়িয়ে ফেলে দেওয়ানী আদালতে তাদের ওপর ডিক্রিজারি করায়।

এতে তার জমিদারীর ওয়াহাবীরা বলে, বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে কৃষ্ণদেব যে ভাবে হোক বশ করেছে। তার এজলাসে আমরা সুবিচার পাব না। আমরা কলকাতায় যাব। জজের এজলাসে সব কথা জানিয়ে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আপীল করব।

—কোম্পানি সরকার করবে গরিবের ওপর সুবিচার? কখনও করেনি, কখনও করবে না। হাতিয়ার ধর—এ কথা ফকির বলেছিল।

—কলকাতা গিয়ে দেখি।

ফকির তিতুকে বলেছিল, তুমি ওদেরকে বাধা দিলে না কেন, কেনই বা যেতে দিলে?

তিতু ঈষৎ হেসে বলেছিল, তুমি যা বলছ তাই ঠিক। কিন্তু এখন ওরা হয়তো ভাবে মন্দ সাহেব কুবিচার করেছে, ভাল সাহেব সুবিচার করবে। ওরা নিজেরা গিয়ে সত্যি অবস্থাটা বুঝুক। দেখ না, চলে এলো বলে।

কয়েক দিন বাদেই লোকগুলি সত্যিই মলিন মুখে ফিরে আসে। বলে, না, দেখা হল না। জজ চলে গেছে বাখরগঞ্জে। কোন বা কাজে।

॥ আট ॥

১৮৩১ সালের ৬ই নভেম্বর পুঁড়াগ্রামের মধ্যে বারোয়ারি কার্তিক পুজো উপলক্ষে পালাগান হচ্ছিল। তিতু ও তার মুজাহিদরা আসছে বুঝেই কৃষ্ণদেব বাড়ির ফটক বন্ধ করে দেয়। তিতুরা বাড়ি ঘিরে ফেলে। জমিদার বাড়ি থেকে ইট পড়তে থাকে। কোন মতেই ফটক ভাঙতে পারে না তিতু। এগোয় গ্রামের দিকে। এ গ্রামের ধনী মুসলমানরা তো তার বিপক্ষে। এই সব ওয়াহাবী-বিরোধীদের বাড়ি ও পুঁড়া বাজার লুট হয়। ইয়াসিন মোল্লা কানে শোনে না। ছোটবেলা থেকেই সে কালা। তিতু ও মুজাহিদদের আক্রমণ ও হইহল্লা সে কিছুই শোনেনি। কিন্তু হুঁকোর জলে চোখ ধোয় বলে তার নজর খুব সাফ।

চেয়ে দেখে ব্যাপারটি বুঝেই সে বাড়ির লোকজনসহ পিছনের কলাবাগানে দৌড়য়। বাপরে! তার দরজা ভাঙা হচ্ছে, ঘর লুট হচ্ছে তা সে ভালই বোঝে। গেল, সবই গেল। তা যাক। ধড়ের ওপর মাথাটা থাকুক। সে তো কৃষ্ণদেবকে বলে এসেছে, দরকার পড়লে ঢোলসোহর দিয়ে বলব যে মুসলমান বলে পীর-মোল্লা কিছু নয়, একমাত্র আল্লা সর্বশক্তিমান, সে মুসলমানই নয়। আপনি কি বলতে যাচ্ছেন যে পুরোহিত-পূজারী কেউ নয়, দেবতাই সব? নায়েবকে টপকে কেউ জমিদারের কাছে যেতে পারে?

বিবি তাকে বলেছে, আমাদের মুনিষ-কামলা সব তিতুর লোক। আপনি এমন কথা বলে বেড়াবেন না।

বুঝি তিতু সব জেনে ফেলেছে।

তিতুরা এগোতে থাকে। এ সময়ে কে বলে, জমিদার আমাদের মসজিদ পোড়াতে পারে। নমাজ নষ্ট করতে পারে তো আমরা বা মন্দির রাখি কেন?

ওরা মন্দিরটি গোরক্তে অপবিত্র করে। পুরোহিত এ দৃশ্যে রাখ্ রাখ্, মার্ মার্ বলে বলির খড়্গ নিয়ে ছুটে আসে ও নিমেষে

মরণান্ত চোট খায় মাথায়। তিতুরা এর পর পুঁড়া গ্রাম ছেড়ে আসে।

এর পর আর ফেরার পথ থাকে না। এখন নারকেলবেড়িয়াতে তৈরি হয় বাঁশের কেল্লা। অত্যন্ত ঘন সন্নিবেশে পোঁতা হয় বাঁশের খুঁটি। এমন চারসার বাঁশে পুরু ও শক্ত দেয়াল হয়। বাঁশের ঘর, বাঁশের ছাদ। ঘরে ঘরে অস্ত্রশস্ত্র, চাল-ডাল লবণ, ইটের স্তূপ। দরকারে তুই হাজার লোক ভেতরে থাকতে পারে কেল্লা এতই বড়।

এখানে বসে তিতু মীর ঘোষণা করে, কোম্পানী সরকার আজ্ঞ চুয়াত্তর বছর আগে বাংলার নবাবকে হারিয়ে হিন্দুস্তানের দখল নিতে শুরু করে। দিল্লীর বাদশাহকে হীনবল করাও কোম্পানীর চক্রান্ত। এই বিদেশী ইউরোপীয়রা অন্যায় করে মুসলমানের রাজত্ব নিয়েছে। এখন তাদের লীলাখেলা শেষ হয়েছে। আবার স্বাধীন হিন্দুস্তানে মুসলিমরাজ হবে, আমিই রাজা।

পুঁড়া, গোবরডাঙা, গোবরাগোবিন্দপুর—সব জমিদারদের কাছে তিতু রাজস্ব দাবী করে। নীলকর সাহেবরা বেনামী সম্পত্তি করে জমিদার হয়েই বসেছে। তাদের কাছেও চিঠি যায়। চিঠিতে লেখা হয়—'এ দেশএখন আমাদের দীন মোহাম্মদের। অতএব তোমরা এখনই অবশ্যই ফৌজের জন্য খাদ্যশস্য পাঠাবে। পাঠালে পরে আল্লার দরবারে সম্মান পাবে, তিন বছর খাজনা মুকুবি পাবে। যদি না পাঠাও, তাহলে এ পরোয়ানার জবাব এলেই আমরা আসব এবং তোমাদেব সঙ্গে যুদ্ধ করব। স্বাক্ষর : নিসার আলির পুত্র তিতু মীর।'

জমিদাররা নড়ে চড়ে ওঠে। এ কি ভীষণ প্রস্তাব, এ কি পরোয়ানা? গোবরডাঙার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কলকাতার ধনকুবের লাটুবাবুর প্রাণের বন্ধু। কয়েক বছর না যেতেই সাতুবাবু। লাটুবাবু কলকাতায় জমিদার সমাজের একটি থাম বিশেষ হবে। ওরা অগাধ সম্পত্তি ওড়াবে বুলবুলি লড়াইয়ে। মায়ের শ্রাদ্ধে, ছেলের বিয়েতে। এই কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কুশদহ-গোবরডাঙায় ইন্দ্রপুরী বসিয়ে মায়ের শ্রাদ্ধ করবে। পঞ্চাশ হাজার কাঙালী খাবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে চোদ্দ হাজার খাবে। এমন ঘটা হবে যে

তা দেখে কলকাতার সবাই ভাববে, মা মরুক। কালীপ্রসন্নকে টেক্কা দিয়ে মায়ের শ্রাদ্ধ করি।

এই সবই হবে তো প্রজা পিটিয়ে, প্রজা ঠেঙিয়ে। কর্ণওয়ালিশ যা করে দিয়েছে তাতে বংশানুক্রমে সাহেবদের বশংবদ হয়ে থাকতে পারি। সাহেবরা কুকুর পোষে, কুকুর বড় প্রভুভক্ত। সাহেবরা আমাদের প্রভু। কুকুর যা পারে না, আমরা তেমন প্রভুভক্তি দেখাতে পারি।

এই লোকটা বলছে, ইংরেজের কাল শেষ হয়েছে। এ কি কথা? ইংরেজের এ বন্দোবস্তে হাজারে হাজারে জমিদার আর মধ্যস্বত্বভোগী জন্মাচ্ছে। সরকার নিজেও তো খাসমহলের জমিদার। এমন ব্যবস্থা আছে বলেই কালীপ্রসন্ন গেঁয়ো জমিদার হলেও মায়ের শ্রাদ্ধে হাতি দেবে।

কালীপ্রসন্ন লাটুবাবুকে জরুরি খবর দিল। জমিদারের বিপদে জমিদার ঠিক তেমনি করে সাড়া দেয়, যেমন করে কাকের দল জোট বাঁধে একটি কাক বিপদে পড়লে। লাটুবাবু তখনই কালী-প্রসন্নকে দুশো হাবসী পাঠাল। লাটুবাবুর আর সাতুবাবুর সম্পত্তির গোড়াপত্তন যদিও ব্যবসা-বাণিজ্যে কিন্তু ব্যবসার টাকা ব্যবসায়ে কে সম্পূর্ণ লাগায়। তার চেয়ে জমিদার হওয়া বাঙালীর স্বভাবে পোষায়। ফলে তাদের অসাগর জমিদারী। আর জমিদারী রাখতে দুই ভাইকে রীতিমত ফৌজ পুষতে হয়।

কালীপ্রসন্ন দেখল তার শ'চারেক লেঠেল, লাটুবাবু পাঠাল, দুশো বন্দুকধারী হাবসী। সৈন্যবলে বলী হয়ে সে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করল।

কালীপ্রসন্ন মোল্লাহাটি নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিসকে খবর পাঠাল। ডেভিস দুশো লেঠেল-বর্শেল ও কয়েকটি বন্দুক নিয়ে রওনা হয়। সে চলে বজরায় ভেসে ইছামতীর বুক ধরে। নদীর পাড়ে নেমে সে হাতিতে ওঠে। গোবরাগোবিন্দপুর জমিদারী কাছারির হাতি। সুবল গোলককে বলে, হাতি এনেছ, ছাতা আনতে পারনি?

সুবল একটি ঝাঁপালো গাছের ডাল ভেঙে দেয়। তাই মাথায় দিয়ে ডেভিস চলে। সুবল সামনে চলে লাঠি হাতে।

—কই, কোথায় তোমাদের তিতু মীর ?

—আছে সাহেব, আছে।

—চল চল, আমি ইংরেজ, বাঙালী নই। তিতু মীরকে তোমরা ভয় পেতে পারো, আমি ভয় পাই না।

কিন্তু তিতু ডেভিসের জন্যে তৈরিই ছিল। নদীয়া আর বারাসত জুড়ে যারা নীলকুঠি বানিয়ে ধানের জমিতে বিষ ঢেলে দিয়েছে ডেভিস তাদেরই একজন। মোল্লাহাটির কুঠি তো ত্রিশ বছর বাদে নীল বিদ্রোহে জ্বলে যাবে। তিতু ও তার মুজাহিদরা এগোতে থাকে।

তাদের এগিয়ে আসার মধ্যে কি ছিল ? শতখানেক লোক লাঠি হাতে ধেয়ে আসছে, তিতুর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। সাহেব মাহুতকে বলে, হাতির মুখ ঘোরাও, পারঘাটে চল !

সাহেবকে পালাতে দেখে তার লেঠেল-বর্শেলরা ঘাবড়ে যায়। তিতু গর্জন করে বলে, ওরা তো চাকর। মাইনে খেয়ে লড়ে। তোমরা স্বাধীন। দেশকে জিতে নেবে বলে লড়ছ। ওদের চেয়ে তোমাদের জোর বেশি।

ফকির বলে, মারো মারো ! ওরা গরিবের হাতে লাঠি দেখলে ভয়ের চোটে বন্দুক দেখে।

সাহেবের লোকরা পড়তে থাকে মাটিতে। তিতুর লোকরা নির্দয় নির্মমতায় লাঠি ঘোরায়। হেঁকে বলে, সাহেবের নিমক খেলে কি ভাইবোনদের সমান মানুষকে মারতে হবে ? সে কাজ যখন করেছ তখন ছেড়ে দেব না।

ডেভিস বজরার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে গুলি ছোঁড়ে। তবু ওরা এগোচ্ছে। আর লাঠি হাতে নিয়ে এক বৃদ্ধ ফকির আগে দৌড়চ্ছে। ডেভিস ভাবে এ নিশ্চয় ফকিরের জাদুমন্ত্রে হচ্ছে। জাদুমন্ত্রের জোরে তার বন্দুক নিশানা বেঁধেনি। ওই লোকগুলিও মন্ত্রবলে বলীয়ান। ডেভিস হাতির পিঠে নদী পেরোয়। গোবরা-

গোবিন্দপুরের দিকে দৌড়য়। সেখানে দেবনাথ রায় আছে, বিশ্বস্ত জমিদার।

দেবনাথের কাছারিতেই ডেভিসের ছত্রভঙ্গ ও পরাজিত লেঠেলরা এসে জোটে।

সুবল বলে, তোদের সাহেব তিতু মীরকে ভয় পায় না তো পালাল কেন? তোরাই বা হেরে এলি কেন?

—আর নয়, তিতুর সামনে নাকে খত দিয়েছি। বাপরে লাঠি খেলা, ওরা শিখল কোথায়?

ডেভিস বলল, ফকির বুজরুকি করেছে।

—ধন্য বুজরুকি।

দেবনাথ বলল, আমি ফকিরকে ভয় করি না। আমার সামনে পড়ুক তিতু, আমি দেখে নেব। শেরপুরের ধনী মুসলমান আমাকে বলছে, রায়মশায়! তিতু মীরের শিষ্য হয়ে গেল আমার প্রজারা। সব চলে যাচ্ছে। যা হয় একটা বিহিত করুন। আমিই দেখব।

—দেখ রায়, দেখ।

—আমার জমিদারীতে ওয়াহাবী নেই।

সুবল হাতিটি আস্তাবলে নেওয়া অবধি থাকে। তারপর সে দৌড়য় ইছামতীর দিকে। তিতুর লোকেরা ততক্ষণে বজরাটি পাড়ে টেনে তুলে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে।

—তিতু মীর। তিতু মীর!

—কে হে তুমি?

—আমি দেবনাথ রায়ের কাছারির লোক। ডেভিস আর তার লোকেরা দেবনাথের কাছারিতে। শেরপুরের ইয়ার মহম্মদ তোমাকে বলে, হ্যাঁ তিতু! তুমি যা বল তাই ঠিক। আর দেবনাথকে তাতাচ্ছে তোমাকে আক্রমণ করতে। আমি চললাম।

—আমাকে এ খবর দিলে কেন?

—আমাদের সঙ্গে তোমাদের কোন বিবাদ নেই। আমরা আগেই এ কথা ঠিক করে নিয়েছি। আমাদের গ্রাম থেকেই তো তাজু আর কাসিয়া এসেছে তোমার কাছে। তাদের বোলো যে ঘরে সবাই

ভাল আছে।

সুবল ফিরে যায়। তিতু বলে, দেবনাথ রায়। ইয়ার মহম্মদ! দুজনকেই দেখতে হচ্ছে। সকলকে খবর দাও। এখন আর দেরি করার সময় নেই। ওরা বাদুড়িয়া যাবে। বারাসত যাবে। অত সময় দেব কেন?

লাঘাট্টা বা লাউঘাটিতে, ইছামতী তীরে দেবনাথ রায় ও তিতু মীর মুখোমুখি হয়। দেবনাথ ঘোড়ার পিঠে, হাতে তরোয়াল। তিতু মাটিতে দাঁড়িয়ে, তার হাতে লাঠি। তার মুজাহিদরা লাঠি, বর্শা তরোয়ালে সুসজ্জিত।

—তিতু মীর! ইংরেজকে সরিয়ে রাজা হবি, তোর মরণ আজ আমার হাতে।

—কেন দেবনাথ রায়? লড়াই না করেই এ কথা কেন?

—দীন! দীন! গর্জনে আকাশ ফেটে যায়। দেবনাথ তরোয়াল ঘোরাতে থাকে। তিতুর চোখে প্রশংসা ফুটে ওঠে। যে লড়তে জানে তার সঙ্গে লড়ে সুখ আছে!

দু'পক্ষেই হতাহত হয়। এমন তো হবেই, দেবনাথ রায়। তিতু হেঁকে বলে, এরা জমিদারের জুতো-বরদার লেঠেল নয়। এরা হার মানবে না। আজ তুমি সূর্যাস্ত দেখবে না।

দেবনাথ কি বলে তা শোনা যায় না। মাসুমের লাঠি চালনা দেখে তিতুর ডেকে তারিফ দিতে ইচ্ছে করে। হ্যাঁ মাসুম, এটা জেহাদ। দেবনাথ রায়, কুঠেল সাহেবদের বন্ধু, জমিদার কুলে এক দানব বিশেষ। ওর প্রজাদের ঘরে আগুন দেয় তুই অনেক দেখেছিস। চন্দ্রপুরের নাম করা লেঠেল খিদির খাঁ দেবনাথের সামনে গিয়ে পড়ে।

তরোয়ালের কোপ। খিদিরের ডান হাতটি বাহু থেকে উড়ে বেরিয়ে যায়। খিদির গড়িয়ে পড়ে সেই ছিন্ন হাত থেকে লাঠি নেয়। দেবনাথের ঘোড়ার পায়ে ভীষণ ভীষণ জোরে মারে। ঘোড়াটা পড়ে যায়। দেবনাথ উঠতে চায়। ঘোড়ার দেহে তার খানিক চাপা পড়েছে। সে উঠতে পারে না।

হাফিজ ছুটে আসে লাঠি ফেলে তরোয়াল হাতে। দেবনাথ চেঁচিয়ে উঠতে যায় ও নিমেষে তার মাথা গড়িয়ে পড়ে।

দেবনাথের পাঁচশো লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বহুজন মৃত, বহুজন আহত, অন্যরা পালাতে থাকে। ইছামতীর জল লালে লাল হয়ে যায়।

দেবনাথ রায়ের পরাজয় ও মৃত্যুতে কোথায় যেন বাঁধ ভেঙে যায়। নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার দূরদূরান্তে খবর চলে যায় যে দেবনাথ রায় তিতু মীরের কাছে পরাজিত ও নিহত। ডেভিস পরাজিত।

এখন দলে দলে যুবকরা আসতে থাকে। বাঁশের কেল্লার বাইরের দেয়ালে পড়ে মাটির আস্তরণ। আর মাঠে চলতে থাকে তরোয়াল ও লাঠি অভ্যাস। কাঁচা বেল ও ইট এসে বড় বড় পাঁজা করা হয়। জোলারা বলে, যুদ্ধকালে আমরা ওগুলো ছুড়ে যুদ্ধ করব। লাঠি বা নাঙ্গা তরোয়ালে আমাদের সুবিধে হবে না।

ঢোলসোহর দিয়ে তিতু ঘোষণা জানায়, কি হিন্দু, কি মুসলমান! কোন প্রজাই খাজনা দিও না জমিদারকে।

তালুকদার, মহাজন, নীলকুঠির সাহেব, ওয়াহাবী বিরোধী ধনী মুসলমানদের কাছে আবার পরোয়ানা চলে যায়। রাজস্ব দাও তিতু মীরকে। নইলে কঠোর দণ্ড পাবে। দেবনাথের কথা মনে রেখো।

এখন নীলকররা পালাতে থাকে কুঠি ফেলে রেখে। জমিদার তালুকদার, ধনী মুসলমান, মহাজন, সব পালায়। চল বারাসতে, চল গোবরডাঙায়, চল কলকাতা। নীলকরদের বিস্তীর্ণ বেনাম জমিদারীর খাজনা পড়ে থাকে, প্রজারা ক্ষেতে নীলচাষ বন্ধ করে দেয়।

নারকেলবেড়িয়ার অনেক কাছে কলিঙ্গা। কলিঙ্গার দারোগা মুসলমান। সে তিতুকে গোপনে জানায়, জমিদার ও কুঠিওয়ালারা এবার একজোটে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাবে। তিতু তুমি তৈরি থাকো। আমি প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারি না, কেননা আমি সরকারের নিমক খাই। তবে

গোপনে আমি তোমাকে সমর্থন করি। সেজন্যই আমার কাছ থেকে কোন খবর বাইরে যায়নি। আমার জমাদারটি তো চাইছে যে খবর দিক, সে বখশিস পাক।

তিতু বলে পাঠায়, সবই সে মনে রাখবে।

এবং সে হঠাৎই যায় শেরপুরে। ইয়াব মহম্মদের ভাইয়ের বাড়ি লুঠ করে। হাজির হয় ইয়ার মহম্মদের বাড়ি।

বলে, কি ইয়ার মহম্মদ, অবাক হলে?

—না, মানে···না, মানে···

—তুমি তো আমার সমর্থক।

—তা তো বটেই, তা তো বটেই।

—আবার একদিকে দেবনাথ রায়েরও বন্ধু! তিতু ঈষৎ হেসে বলে, দেবনাথকে অনেক করে ধরাধরি করেছিলে—বেচারা দেবনাথ।

—তুমি কোথায় কি শুনেছ!

—সেটা ভুল শুনেছি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আরে, আমি মুসলমান। আমি তোমাকে সমর্থন তো করব, তাই তো স্বাভাবিক। আমি কেন তার কাছে যাব?

—ভাল ভাল ইয়ার মহম্মদ। আমার সমর্থনে এমন ধনী লোক আছে? ভাল। তা দোস্তালিটা পাকা করতে চাই।

—বল কি করতে হবে? শুধু জানে মেরো না। আর যা বল তাই করব।

—সবাই শুনেছ এ কি বলছে?

—শুনলাম।

—তা জানটা তোমার থাকুক। আমি জানি যে তোমার ছুটি মেয়ে আছে। তাদের সঙ্গে আমার এই দুই মুজাহিদ কালু আর মহীবুল্লার বিয়ে দিতে হবে। মুখটা সাদা হয়ে গেল কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি যে ওরা তোমার ভাইয়ের কামলা ছিল। ওরা এমন মুজাহিদ। যাও, আয়োজন কর। অনেক দিন এরা মন খুলে আনন্দ করেনি।

এমন বিয়ের প্রস্তাবে ইয়ার মহম্মদের অন্তঃপুরে সবাই থ মেরে

যায়। ইয়ার মহম্মদ বলে, আমার জানটা বড়, না মনপছন্দ জামাই বড় ?

বিয়ে হয়।

এরপরেই তিতুর মুজাহিদরা রামচন্দ্রপুর ও হুগলী গ্রামের সব ধনী মুসলমানদের বাড়ি লুঠ করে। নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার এক বিস্তীর্ণ অংশ ছেড়ে পুলিশ পালায়। গ্রামের লোকগুলি গান গায়—

যা পারেনি হাজার পীরে
তা পারলে তিতু মীরে॥

তারা বলাবলি করে, এ কি স্বপ্ন না সত্যি ? নীলকর নেই, জমিদার নেই, পুলিশ নেই, এ কি হল ? বাঁশের লাঠির এমন মহিমা তা তো জানিনি। এমন দিনটা থাকলে হয়।

বুড়োরা কেবলই মাথা নাড়ে আর মাথা নাড়ে। এমন দিনই চিরস্থায়ী হবে ? তা কখনো হয় ? জমিদারদের চেনো না ? চেনো না নীলকরদের ? বাংলার মাটি নীলের বিষ গিলেছে। সে কি সে বিষ উগরে ফেলতে পারবে ? কোম্পানী সরকার যত জেঁকে বসছে, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তত বাড়ছে।

অনেক আগে তো এ সব কারণেই যে যার ঝাণ্ডা আর ধ্বজা তুলেছিল সন্ন্যাসী আর ফকিররা। গরীব লোকেরা তো সে ঝাণ্ডা আর ধ্বজার নিচে সমবেত হয়েছিল। শেষরক্ষে হল কি ?

যুবকরা বলে, কি বলতে চাও ? সেটা কি মিথ্যে ? তিতুর লড়াই কি মিথ্যে ?

—না না। এ তো খুবই সত্যি। কিন্তু ভয় হয়। আমরাও তো চাই যে ইছামতীর কূল ধরে হেঁটে যাব দূরে দূরে। কত খাল, বিল, নদী। দেখব কোথাও নীলকুঠি নেই। যত যাব, কোথাও দেখব না জমিদারের হাতি ঘর ভাঙছে, ধান খাচ্ছে। আমরা তো তাই চাই।

—ভূষণার জমিদার মনোহর রায় তো পালায়নি। সে জন্য তিতুকে চাল রে, ডাল রে, নানাবিধ জিনিস পাঠাচ্ছে।

—তেমন আর ক'জনা ?

—ভূদেব পালচৌধুরীর লেঠেল বর্শেল সব তিতুর সঙ্গে। "সে তো খুবই করছে।

—হ্যাঁ। শুনলাম গোবরডাঙার জমিদার তাকে ছ্যা ছ্যা করেছে। সে জবাব দিয়েছে, তিতু এককালে আমার মহা উপকার করেছিল। এককালে কেন বলি, এখনো করছে। তার কারণে অনুগত, সাহসী লেঠেল পেয়েছি। সেই জোরে জমিদারী রেখেছি। তা আমি ভুলতে পারি? আমরা সেকেলে জমিদার। আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অন্য রকম। তবে পালিয়ে বাঁচতে হচ্ছে না, সেখানে আমার জিত।

—ভাল বলেছে। জবাব শুনে গোবরডাঙার জমিদারের মুখে চুনকালি মেখে গেল। সে কথাটি না বলে পালাল।

বুড়োরা বলল, হ্যাঁ। এটা দেখে যাব ভাবিনি! আমাদের কথা ভাবতে তো মানুষ নেই। তবু দেখে গেলাম যে চাষী গেরস্তর ছেলে তিতু মীর, তার নাম শুনলে কুঠেল জমিদার পালায়। এটা খুব শান্তি পেলাম মনে। এর পর কে নিচে যাব, কে চিতায় শুয়ে পুড়ব, দুঃখ থাকবে না কোন।

এমন সময়ে নারকেলবেড়িয়ার সবচেয়ে কাছের নীলকুঠি থেকে এজেন্ট পাইন, কলকাতায় মালিক স্টর্মকে চিঠি লেখে।

সরকার এত ঘটনার কিছুই জানেনি। কয়েকটি নীলকুঠির ম্যানেজার ও এজেন্ট তাদের মালিকদের জানায়। এখন আস্তে আস্তে কথা ছড়াতে থাকে। অধিকাংশ ইংরিজি ও বাংলা রিপোর্ট অনেক পরে বেরোয়।

বারাসতে বসেও ম্যাজিস্ট্রেট খবর রাখেনি কিছু। স্টর্ম সাহেব অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে নদীয়া ও বারাসতে ম্যাজিস্ট্রেটদের জানায়। পাইনের চিঠি পাঠায় ডেপুটি গভর্ণরকে। এখন সরকারের টনক নড়ে। নীলকুঠি ও জমিদারবাড়ি, কোম্পানী সরকারের দুটো খুঁটি পরিত্যক্ত? কেন পরিত্যক্ত? ভয়ে। কার? তিতু মীরের ভয়ে। কে এই তিতু মীর? এখন যেন ভাসা ভাসা মনে পড়ে কোন এক জমিদারের সঙ্গে কি একটা সংঘর্ষ হয়েছিল। কিন্তু জমিদাররা বিপন্ন বোধ করছে? এ কি একটা কথা হল?

কলকাতায় বাঙালী সমাজে কোন্ নামী দামী লোকটা জমিদার নয় ? ইংরেজ সাহেবদের খানাপিনা করাতে, বাইনাচ দেখাতে যারা ভীষণ ধন্য হয়ে যায়, তারাই নানা দিকে সমাজের মাথা আর সবাই জমিদার। এরা ভয় পেয়েছে !

নীলকররা তো কোম্পানীর পোষ্যপুত্র। কোম্পানী তাদের পুষছে। প্রজারা নীলচাষ করবে না ? দাদন নিলে নীল চাষে প্রজা বাধ্য, এমন আইন করা হয়েছে। সেই নীলকররা ভয় পেয়ে গেছে ?

প্রশাসনের চাকা ঘুরতে থাকে। জানা যাচ্ছে, তিতু মীর লোকটা কোন বিশেষ ধর্মমতের প্রচারক। এটাই বড় ভয়ের কথা। সন্ন্যাসী বিদ্রোহও তো ঘটিয়েছিল ধর্মীয় লোকরাই।

যশোর জেলার বাগাণ্ডিতে ছিল নিমকপোক্তান। সেখানে কলকাতা থেকে ফৌজ পাঠানো হল। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারকে বলা হল, বাগাণ্ডিতে চলে যাও। সেখান থেকে সিপাহী নিয়ে নারকেলবেড়িয়া যাবে।

আলেকজাণ্ডার নিজে বসিরহাটে গেল। সেখানে বলল, দারোগা ও বরকন্দাজরা যেন অবশ্যই তার সঙ্গে থাকে।

রামরাম চক্রবর্তীই তো দারোগা। দেবনাথের হত্যার পর থেকেই সে সর্বদা শঙ্কায় থাকে। তার মত কে আর জানে যে তিতু মীরকে কে প্রথম খোঁচা দেয়। এখন তো পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেবও আর তার সঙ্গে কথা বলে না।

অথচ ওই কৃষ্ণদেবের কাছারিতে বসে তার টাকা খেয়ে রামরাম জমিদার নির্দোষ, সব দোষ তিতু মীরের এই রিপোর্ট পাঠায়। তারপব কৃষ্ণদেবের কথামত ওয়াহাবীদের ধরে এনে চালান তো রাম-রাম কম দেয়নি।

কে পড়তে চায় তিতু মীরের সামনে ?

তবে সাহেব তো থাকবে। সেই যা ভরসা।

১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর সকাল নটার মধ্যে আলেকজাণ্ডার বাদুড়িয়া পৌঁছে গেল। বাদুড়িয়া থেকে নারকেলবেড়িয়া যথেষ্টই কাছে। সাহেবের সঙ্গে সিপাহী, হাবিলদার ও জমাদার। বাদুড়িয়া-

তে ছিল রামরাম ও বরকন্দাজেরা। এখন আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে একশো কুড়িজন লোক। একশো একুশটা বন্দুকের জোর অনেক জোর। আলেকজাণ্ডারের হিসেবে ছিল, ব্রেকফাস্ট খেয়ে তিতুকে ধরতে যাবে। ধরে এনে চালান দিয়ে তারপর লাঞ্চ খাবে।

এ হিসেবটি থাকেনি। গোলমাল হয়ে যায়। নারকেলবেড়িয়ায় ঢোকার সময়ে কিছুই বোঝেনি আলেকজাণ্ডার। ফলে সে ভীষণ ধাক্কা খায়।

প্রায় পাঁচশো সুসজ্জিত যুবক যুদ্ধের জন্য তৈরি। তরুণ গোলাম মাসুম, তিতুর ভাগ্নে, ঘোড়ায় চেপে তাদের তদারকি করছে। তার কোষে তরোয়াল, হাতে বল্লম।

আলেকজাণ্ডারের প্রথমেই মনে হয় সে ভুল করেছে। এটা কোন ধর্মোথদের ক্ষ্যাপামি নয়। এখন তার মনে সন্দেহ হয়, কলিঙ্গার দারোগা যে আসেনি, তার কারণ সে জানত তিতু কতটা প্রস্তুত।

পাঁচশো লোক ভীষণ গর্জনে যখন বলে, আল্লা হো! তখন আলেকজাণ্ডার বোঝে এটা বিদ্রোহ। সে তো শুনেছিল যে তিতুর সৈন্য সাধারণ চাষীদের নিয়ে গঠিত। তারাই এমন তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

তবু সে সরকারী আদেশ ভোলে না। সিপাহীদের বলে প্রথমে ফাঁকা আওয়াজ করবে। তারপর টোটা ভরে নিয়ে গুলি ছুড়বে।

মাসুম বর্শা বাতাসে ঘোরায় ও বলে, এজলাসে নাজেহাল করেছে, এখন এসেছে সিপাহী নিয়ে! মারো মারো সাহেবকে।

বাঁধ ভেঙে যেমন নদী ছুটে আসে, তেমনি করেই ছুটে আসে মুজাহিদরা। সিপাহীরা ফাঁকা আওয়াজ করে। তারা টোটা ভরার কোন সময়ই পায় না। দূর থেকে তাদের ওপর ইট পড়তে থাকে। লাঠি ও বর্শার আঘাতে তারা ক্ষতবিক্ষত হয়। এখন তারা পালাতে থাকে।

খুব তাড়াতাড়ি নিহত হয় কলকাতা থেকে আগত ফৌজী জমাদার, দশজন সিপাহী ও তিনজন বরকন্দাজ, রামরাম চ্যাটার্জী, কলিঙ্গা

থানার জমাদার ও কিছু সিপাহী বন্দী হয়। আলেকজাণ্ডার চেয়েও দেখে না তার আনা বিশজন সিপাহী অন্য লোকদের কি পরিনাম হল।

সে ঘোড়ায় চেপে পালাতে থাকে। পালাও, পালাও। ঘোড়াকে চালাবার ক্ষমতা নেই তার। ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে পড়ে, ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে ধরে সে পালাতে থাকে। অবশেষে ভড়-ভড়িয়ার খালে নেমে ঘোড়ার পা কাদায় পুঁতে যায়। ঝাঁকনি লেগে আলেকজাণ্ডার কাদায় পড়ে ও তলিয়ে যেতে থাকে। কলিঙ্গার কয়েকটি লোক এসে তাকে টেনে তোলে। শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে তবে সে বোঝে যে এখনো মাথাটা ধড়ের ওপরেই আছে।

তিতু মীর মাসুমকে বলে রামরাম চক্রবর্তীকে রাখো। ওদের ছেড়ে দাও।—কি দারোগাবাবু। আবার দেখা হল?

—তিতু! আমি যা করেছি তা চাকরির জন্যে। তাতে আমার কিছু করার ছিল না।

—সে কি! কাছারিতে বসে ছিলে। কৃষ্ণদেব রায়ের টাকা নিয়েছিলে, মিছে রিপোর্ট দিয়েছিলে। ওয়াহাবীদের ধরে ধরে জরিমানা করেছ, চালান দিয়েছ, সব চাকরির জন্যে?

—আর করব না।

—তা কি হয়? নিমগাছটাকে যত বলি, সে কি পারে মিষ্টি ফল দিতে? মাসুম—একে দূরে নিয়ে গিয়ে মারো। এখানে এর রক্ত পড়লে সে জায়গা অপবিত্র হয়ে যাবে।

রামরামকে মাসুম ধানক্ষেতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আলের ওপর তাকে ফেলেছিল! এই প্রথম রামরাম চক্রবর্তী মাটি ও পাকা ধানের এত কাছাকাছি আসে। মাসুম তলোয়ারটি উঠিয়েছিল, নামিয়ে এনেছিল, উঠিয়েছিল, নামিয়ে এনেছিল।

ম্যাজিস্ট্রেটকে হারিয়ে দেবার পর এদিকে হাজার হাজার লোক নারকেলবেড়িয়াতে আসতে থাকে।

তিতুর মধ্যে কিসের অস্থিরতা যেন! যেন অনেক কাজ সেরে ফেলতে হবে, আর ক্রমেই সে বুঝতে পারছে যে যারা শুধু মার খায় জমিদার, কুঠেল ও সরকারী কর্মচারীদের হাতে, তারাই পারে লাঠি

হাতে ইংরেজ সাহেব ও বন্দুকধারী সিপাহীর সামনে দাঁড়াতে। এ সাহস তাদের মধ্যেই থাকে, শুধু তারা তো জানতে পারে না। কোন একজন তিতু মীরকে তা জানতে হয়।

মাসুমরা খুব আনন্দ করেছিল। যুদ্ধে জেতার আনন্দ। তিতু বলেছিল, এ তো সবে শুরু। এই যে এত লোক আসছে, এত সাহস নিয়ে আসছে, এ সব কিছুকে শক্ত হাতে ধরতে হবে। বাঁধের মধ্যে বানের জলও ধরা যায়। যেটা বেঁধে রাখবে সেটা থেকে যাবে। যা ভাসাতে ভাসাতে আসবে, ভেসে চলে যাবে, তা তো থাকবে না মাসুম। তা দিয়ে তুমি কোন্ ধানক্ষেতে সেচ দেবে?

—আমরা সাহেবকে হারিয়েছি, আমরা সব পারব।

—তাই কি হয়? মইগাছাটা লম্বা। একটা দুটো সিঁড়ি উঠেছ, তার মানে কি ডগায় উঠেছ?

ফকির ওকে আড়ালে ডেকেছিল। বলেছিল, ও সব কথা ওরা এখন বুঝবে না।

—আমি তো বুঝতে পারছি যে সব কাজই বাকি।

—তিতু! সব কাজ কি কেউ একা করতে পারে?

—না না, তা বলিনি।

—তবে?

—কিছু না। একবার বাড়ি ঘুরে আসি

এমন হঠাৎ তিতু এসে পড়েছিল বলে নিসার ওকে দেখে অসম্ভব অবাক হয়ে যায়।

রোকেয়া বলে, তোর আব্বাজনের তো মাটিতে পা পড়ে না আর। তুই যে তোর ছেলে বলে নাম সই করে পরোয়ানা পাঠিয়েছিস চারদিকে—তাতেই সে বলছে, দেখ! কার ছেলে তা তিতু লিখতে ভোলেনি। এমন নামযশ যে ছেলের, সে কেমন খেয়াল রেখেছে।

—বা! আমি তো তোমাদের ছেলে।

—আজ থাকবি?

—না মা। কখন কি চোট আসে। এই এসেছি, এই চলে যাব।

—এখনই ? কিছু খাবি না ?

—খাব ? কি দেবে ?

কি দেয় রোকেয়া তার ছেলেকে এমন অসময়ে, যে ছেলের দেশ-জোড়া নাম, যে ছেলে জমিদার আর কুঠেলের যম ? হাজার হাজার লোক যাকে মানে ? কি দেয় রোকেয়া ? জমজমাট তো এখন নারকেলবেড়িয়াতে।

হায়দারপুর তো যেমন টিমটিমে ছিল তেমনি হয়ে গেছে। রোকেয়া কয়েকটি পথবীজের খই ভাজা মোয়া এনে দিল, এক বদনা পানি।

—তোর ছেলেরা মোটে ঘর আসে না। মায়মুনা কেমন করে থাকে বল ?

—বলব ওদেব।

—ওদেরও অমন জমজমাট ছেড়ে আসতে মনটা চায় না। সে আমি বুঝি। তবু—

—না না, সে কি কথা ? বলব।

—উঠিস কেন ?

—যাই এখন ?

—একবার ভেতরে যা।

মায়মুনা দবজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল।

—কেমন আছ ?

—ভাল। তোমরা ?

—ভাল। তুমি কিন্তু বোগা হয়ে গেছ।

--না না। এখনি যাবে ?

—হ্যা মায়মুনা।

—এসো! শোন, ভাল থেকো, সাবধানে থেকো।

—থাকব।

—বড় চিন্তা হয়।

—কেন চিন্তা কব ? আমি তো কাছেই আছি।

মায়মুনার বলতে ইচ্ছে হয়, কাছে তুমি কখনো থাকনি। সব

সময়েই দূরে থেকেছ। যখন কাছে থেকেছ, তখনও তুমি দূরের মানুষই ছিলে।

সে বলে, কি জানি! নাম-ডাকের মানুষ এখন। কতজন তো বাদশা বলছে। ভাবি, বুঝি বেগমই আনলে একটা!

—তোমার মত কাকে পাব?

গভীর, গভীর সুখে বুক ভরে যায়, চোখে জল আসে। জোর করে হেসে মায়মুনা বলে, এসো। এবার সত্যিই এসো। তোমার দেরি হয়ে যাবে না?

পরে মায়মুনা আর রোকেয়া দুজনেই পাথরের পুতুল হয়ে গিয়েছিল, নিসার হয়ে গিয়েছিল বোবা। ওরা সব কাজই করত নিষ্প্রাণ যন্ত্রের মত। আর ভাবত, সেদিন কেন ওর মুখটা ভাল করে দেখিনি অনেকক্ষণ ধরে। কেন দু'চোখ ভরে দেখে নিইনি? ভেবে ভেবে ওদের সময় কাটত।

তিতুও জানেনি এই হায়দারপুরে ও আর আসবে না। রোকেয়া আর নিসারের ছেলে, মায়মুনার স্বামী, এ সব পরিচয়ে ও আর ফিরবে না।

ও জানত না, নারকেলবেড়িয়াতে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে দিলোয়ার হোসেন, সৈয়দ আহম্মদের এক বিশ্বস্ত মুজাহিদ। সাত মাস ধরে ও আসছে ইংরেজের নজর এড়িয়ে। ও চলেছে ফরিদপুরে। সরিয়তুল্লা ও দুদুমিঞার কাছে।

নারকেলবেড়িয়াতে সব নিস্তব্ধ। দিলোয়ার হোসেন বলল, তিতু মীর! আমি বালাকোট থেকে আসছি।

—বালাকোট?

—হ্যাঁ। বালাকোটে শিখ রাজার সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের পথ-প্রদর্শক সৈয়দ আহম্মদ শহীদ হয়েছেন। বিলায়েত ও এনায়েত পাটনায় অন্তরীণ। আমরা পালিয়েছি।

গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার শ্যালক হিন্দুরাও আমাদের সমর্থক। হাজারে হাজারে হিন্দু আমাদের সঙ্গে আছে, কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাঁর নির্দেশ, স্বতন্ত্র সরকার গঠন করে কাজ কর।

—যে যেখানে কাজ করছে, সে-ই নেতৃত্ব দেবে।

—বেশ, তাই হবে।

পরদিন নারকেলবেড়িয়ায় মইজুদ্দীন বিশ্বাসের ফকিরের উপাসনা ও প্রার্থনার শেষে তিতু মীর হয় বাদশাহ, মইজুদ্দীন উজির, মাসুম সেনাপতি, বাকের মণ্ডল জমাদার, এমন আরো অনেকে।

এ বাদশাহী, মুকুট পরার বাদশাহী নয়। গত রাত্রে যে হায়দারপুর গিয়েছিল আর আজকে যে বাদশাহীর দায়িত্ব স্বীকার করেছে, দুজনের মধ্যে অনেক তফাৎ।

কালকে রাতেও তিতু দিলোয়ারকে বারবার জিগ্যেস করেছে, জেনে নিয়েছে বালাকোটের কথা। সৈয়দ আহম্মদ বলেছিলেন, পাঠান উপজাতিরা স্বাধীনতাপ্রিয় এবং সংগ্রামী।

—তারা সবাই এসেছিল ?

—আসবে না কেন বল ?

সৈয়দ আহম্মদের লড়াই তো একই সঙ্গে ধর্মমতে অবিচল থাকার আর শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম।

সৈয়দ আহম্মদের মধ্যে পাঠান উপজাতিরা তো বটেই, আরো তো অনেকে পেয়েছিল মুক্তির ভরসা। পাঠান উপজাতিদের নিয়ে সৈয়দ আহম্মদ পেশোয়ার জয় করেন। উত্তর-পশ্চিমে যেই তাঁর অধিকারে কায়েম হল। তখনই শিখ নৃপতির সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য।

ভারতের মানচিত্রে তখন ইংরেজের পায়ের কাছে স্ব-স্ব স্বাধীনতার যেটুকু আছে তা বিসর্জন দেবার জন্যে ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে ভীষণ হুড়োহুড়ি। রণজিত সিংও তাদেরই একজন। কেমন করে তিনি সইতে পারবেন সৈয়দ আহম্মদকে ?

বালাকোটের প্রান্তরে যুদ্ধ হয়। ভারতের এই পশ্চিমতম প্রান্তে যুদ্ধ করার জন্যে ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর থেকে ওয়াহাবী ও ফরাজীরা যান। সৈয়দ আহম্মদ ধর্মযুদ্ধে শহীদ হন। স্বাধীনতার ধর্ম রাখার জন্যেই তো তাঁর যুদ্ধ।

তিনি অনেকখানি দায়-দায়িত্ব একা বহন করে গেছেন। আজ

সকল ওয়াহাবীকে তেমনি করে ভাবতে হবে। কেননা ওয়াহাবী আন্দোলন চলবে, তার বিনাশ নেই।

তিতু সব জেনে নিয়েছে দিলোয়ারের কাছে। দিলোয়ার বলে, তুমিই তাকে যোগ্য সম্মান জানিয়ে চলেছ তিতু। এই লড়াই করে চললে তিনি সম্মান পান সবচেয়ে বেশি।

তারপর যেন নিজেকেই বলেছিল, কালো ঘোড়ার পিঠে তিনি, তরোয়াল চলছে না তো বিদ্যুৎ খেলছে। এগোচ্ছেন যত তত ওরা পিছোচ্ছে। শেষে পিছন থেকে গুলি চালাল। ঘোড়া ওঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল!

তিতু মীর বলে, এরা যতই বলুক যে আমরা হিন্দুবিদ্বেষী, সে কথা সত্য নয়। কোন ধর্মকে আমরা বিদ্বেষ করি না। তাহলে ধনী মুসলমানরা আজ আমাদের চোখে 'শত্রু' হত না। আমাদের ধর্ম স্বাধীনতার ধর্ম।

তিতুর বাদশাহী বিশাল এক অঞ্চলের গরিব হিন্দু, গরিব মুসলমান মেনে নেয়।

আর সাতক্ষীরা, গোবরডাঙা, রাণাঘাট—দিকে দিকে জমিদাররা পায় পরোয়ানা। আমরা সরকারের সঙ্গে লড়াই করতে চলেছি, সৈন্যদের জন্য রসদ দাও। নইলে তোমাদের পরিণাম খুব খারাপ হবে।

জমিদাররা একজোট হয়। সবাই আলোচনা করতে থাকে। সকলেই কৃষ্ণদেব রায়কে দোষ দিতে থাকে।

কাজ যা করলে তা ভালই করলে। দাড়ি রাখছিল, নামাজ পড়ছিল, তহবন্দ পরছিল, তাতে তোমার কোন্ ক্ষতিটা হচ্ছিল? দারোগাকে দিয়ে তাদের হয়রানি করালে, ভাবলে খুব জব্দ করেছি। এখন পরিণামটা কি হল?

সুদ দেবে না, হাটে তোলা তুলতে দেবে না, নীলকরকে দাদন দিতে দেব না, এও তো ছিল।

সে সব তো বুঝলাম। এখন উপায় কি?

কুঠেল সাহেবকে মেরে ভাগাচ্ছে, বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট পালিয়ে বাঁচছে, এ যে মহা বিপদ।

সবাই মিলে নদীয়ার কালেক্টরকে দরখাস্ত করা যাক। যদি কিছু হবার হয় তো এভাবেই হবে। এর মোকাবিলা করতে কামান-বন্দুক-মিলিটারি চাই।

জমিদাররা সবাই মিলে নদীয়ার কালেক্টরকে আর্জি জানায়। আর কলকাতায় বসে গভর্ণর জেনারেল বেন্টিংক বোঝে, তিতু মীরকে জব্দ করতে হলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথ আর জজ এনড্রু জ বন্দুকধারী দু-তিনশো লোক নিয়ে নারকেলবেড়িয়ার দিকে এগোয়। ওরা ইছামতী ধরে বজরায়, পাড় দিয়ে পায়ে হেঁটে, হাতির পিঠে যায়।

সকালে নারকেলবেড়িয়া পৌঁছে স্মিথ দেখে বহু মুজাহিদ সশস্ত্রে হাজির। তারা একটুকু বিচলিত হয় না। বর্শা, বল্লম ও তরোয়াল তুলে তারা ধেয়ে আসে।

সঙ্গে সঙ্গে বিশ-ত্রিশজন বাদে ম্যাজিস্ট্রেটের সব লোকরাই পালাতে থাকে। তিতুর লোকরা ম্যাজিস্ট্রেটের লোকদের কাটতে কাটতে এগোয়।

ম্যাজিস্ট্রেটও পালাতে থাকে। যারা অন্য পথে যায়, তারা পড়ে মাসুমের হাতে। বারঘরিয়ার নীলকুঠি তখন তিতুর দখলে। তার আড়াল থেকে পলায়নপর লোকগুলির ওপর ইট ও কাঁচা বেল পড়তে থাকে। তারা পড়ে যায়।

ইট ও কাঁচা বেলের কাছে বন্দুকের পরাজয়! লজ্জায় ম্যাজিস্ট্রেটের মাথা কাটা যায়।

ইছামতীর তীরে পৌঁছে, ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ দুটি পালকিতে উঠে বসে। এভাবে শুধু মার খেয়ে চলে যাব?

নৌকো থেকে হালকা কামানে গোলা দাগা হয়। এনড্রু জ বন্দুক ছোড়ে। কোনও লাভই হয় না। তিতুর লোকরা সগর্জনে নৌকো নিয়ে তাড়া করে। স্মিথের ফৌজদারি নাজির মহম্মদ সেলিমের আর্তনাদ স্মিথ শোনে। সেলিমের মাথা নেমে যায় মাটিতে।

এ কি ভীষণ অভিজ্ঞতা। এ কি অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা। স্মিথ ও এনড্রু জ বন্দুক ফেলে হাঁচড়ে পাঁচড়ে কোনমতে নদীর ওপারে

গিয়ে ওঠে। তারপর দৌড়তে থাকে। মাইল খানেক দূরে জমিদারদের হাতিগুলি পাওয়া যায়। দুই সাহেব নিরাপদ দূরত্বের খোঁজে পালায়।

এখন বেন্টিংককে সেনাবাহিনী তলব করতে হয়। কলকাতার এত কাছে, বারাকপুরের বিশাল ফৌজী ছাউনির এত কাছে, সংঘবদ্ধ চাষী, জোলাদের কাছে বারবার খোদ ইংরেজরা হেরে যাচ্ছে? ইংরেজের মুখটা থাকছে কোথায়?

পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায় অনেক দিন অবধি ধাতস্থ হতে পারে না। স্মিথ ও এনড্রুজের সঙ্গে সেও গিয়েছিল। ওই ভীষণ মার মার কাট কাটের মধ্যে কৃষ্ণদেবও যে ছিল তা তিতুরা দেখেনি। দেখেনি বলেই কৃষ্ণদেব পালিয়ে বাঁচে। সে চমকে চমকে ওঠে ও চারদিকে তিতুকে দেখতে থাকে।

গভর্ণর জেনারেলের আদেশে এক হাবিলদারের নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী ফৌজ রওনা হয়ে যায়। এই সওয়াররা বারাসতে পৌঁছে থেমে গেল। না, ইনফ্যান্ট্রি আর আর্টিলারি না এলে ক্যাভেলরি যাবে না।

বারাসতের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারও এদের সঙ্গে থাকে। এখানে এসে ক্যাপ্টেন সাদারল্যাণ্ড অশ্বারোহী দলের নেতৃত্ব নেয়।

মেজর স্কট বারাকপুর থেকে আনে একটি সম্পূর্ণ পদাতিক-বাহিনী। লেফটেনাণ্ট ম্যাকডোনাল্ড দমদম থেকে আনে দুটি কামান-সহ এক গোলন্দাজ বাহিনী।

নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট গোবরডাঙা, চাঁদুড়িয়া ও রাণাঘাটের জমিদারদের হুকুম দেয়—সেনাবাহিনীকে রসদ যোগাবে।

ঠিক একই চিঠি পাঠায় তিতু মীর।—জমিদাররা রসদ পাঠাও আমার সৈন্যদের। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখে, কোন ভাবেই তুমি আমার সৈন্যদের বাধা দেবে না।

তিতু মাসুমদের ডেকে বলে, বারবার তিনবার ওরা হেরেছে। এবার খুব সাজগোজ। ভয় করছে, মাসুম?

মাসুম হাঁটু গেড়ে বসে ছিল, উত্তরে তিতুর হাঁটুতে কপাল ঠেকিয়েছিল বারবার।

মাসুম! মাসুম! তুই যখন ছোট ছিলি শুধু হাসিনার ছেলে, আমি ছিলাম তোর আদরের মামা, তখন এমন করে কপালে হাত ঠেকালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম। এখন তো তা হয় না। আমাদের দুজনেরই অন্য পরিচয়, অন্য দায়িত্ব এখন। মাসুম! ভয় করছে তোর?

—একটুও না।

—খুব ভাল কথা শোন্, খুব জোর দৌড়াতে পারে এমন কাউকে ডাক। ভূদেব পালচৌধুরীর কাছে পাঠাব।

—এই ছেলেটা যাবে।

—চরণ বাগ্দীর ছেলে না?

—হ্যাঁ। ওর নাম কানাই।

—ও-ই চিঠি নিয়ে যাক। লেখ—

—তুমি ওকে মুখে বলে দাও। ও যা শোনে তাই ময়নার মত বলে যেতে পারে।

কিশোর ছেলেটি উৎসাহে জ্বলে ওঠে। পারেই তো সে সব মনে করে করে বলতে। সেইজন্যেই তো মন্দিরের পুরুত বলে, ঘোর কলি! এমন মনে রাখবার ক্ষমতাটা বামুন কায়েতকে দিল না ভগবান, দিল বাগ্দীর বেটাকে!

তিতু নিশ্বাস ফেলে। বলে, ধনদৌলত, জমি-জেরাত সকলই ওদের। বাগ্দী, চাঁড়াল, যদি খানিক সাফা দিমাক পায় তাও ওরা সইতে পারে না।

—কি বলব?

—বলবে, এবার লড়াই বড় ভয়ানক। কি হবে তা জানা নেই। আমার লোকজন আপনার কাছে যদি যায় তাহলে আপনি তাদের যশোরে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

—কি বলবে?

—এবারে লড়াই বড় ভয়ানক। কি হবে তা জানা নেই। আমার

লোকজন আপনার কাছে যদি যায়, তাহলে আপনি তাদের যশোরে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

—ঠিক আছে, লক্ষ্মী ছেলে, চলে যাও।

তিতু মীর ফকিরকে ডাকে। বলে, যুদ্ধে জিত থাকে, হারও থাকে। যদি বাঁশের কেল্লা দাঁড়িয়ে থাকে, তবে কোন কথা নেই। যদি কেল্লা পড়ে যায়, আপনি যতজনকে পারবেন তাদের নিয়ে যশোরে চলে যাবেন। সেখান থেকে ফরিদপুর। সরিয়তউল্লা আছে, দুদু মিঞা আছে।

—বুঝলাম।

ঠিক এই কথাই তিতু মীর তার মুজাহিদদের বলে ১৮৩০ সালের ১৯শে নভেম্বর। সবাই স্নান করে নেয়, নামাজ পড়ে নেয়। জওহার, গওহার ও তোরাব—তিন ছেলের দিকে চায় তিতু মীর। না, আমার ছেলে বলে বিশেষ কি বলব ওদের? সকলের মত ওরাও মুজাহিদ।

—মুজাহিদ ভাই সব! আজ কোম্পানী সরকার মস্ত ফৌজ-কামান-বন্দুক নিয়ে আসছে! আজকের লড়াই বাঁশের কেল্লার ইজ্জতের লড়াই। ওদের মত কামান-বন্দুক আমাদের নেই। তবু কেল্লাকে উঁচু রাখার জন্যে লড়ব। জিতলে এ আমাদের আমরা এই মালনা। হারলে এ আমাদের বালাকোট। কে বলতে পারে কি হবে?

তিতু সকলের দিকে চায়।

ওরা আসতই। জমিদার-মহাজন-কুঠেল সাহেব! কোম্পানী-সরকার কি পারে চুপ করে থাকতে? ওদের গায়ে যে চোট লেগেছে। আর খোদ সাহেবরা হেরে পালিয়েছে বারবার। এতে ওদের অপমান হয়েছে। আমি জানি না আজ দিনের শেষে আমরা সবাই একসঙ্গে হব কি না, কিন্তু এটা জানি যে এক মুজাহিদ মরলে হাজার মুজাহিদ জন্মাবে। সৈয়দ আহম্মদ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, আমরা সেই পথে লড়ব। ভাই সব! এসো, আজ সবাই কোলাকুলি করে নিই।

সবাই সবাইকে আলিঙ্গন করে। এ বড় আনন্দের আলিঙ্গন আজকে সূর্য অস্ত গেলেই তো তিতু মীর আর বাঁশের কেল্লা হবে

যাবে ইতিহাস, কিংবদন্তী। তিতুর আন্দোলন যাদের মনে মুক্তির স্বাদ এনেছিল, তাদের জীবনগুলিকে শেকলে বেঁধে আবার তুলে দেবে মহান বেন্টিংক, সতীদাহ-নিবারক বেন্টিংক, জমিদার-মহাজন-নীলকরদের হাতে।

সতীদাহ নিবারণ করে বেন্টিংক 'মহান, উদার' এমন সব প্রশস্তি পাবে বাংলার সেই সব মানুষের কাছে, যারা এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সন্তান। তখন বাংলার কৃষক মরবে কাছারিতে, আদালতে, নীলের কুঠিতে।

আজকের পর সব হবে, স—ব। কয়েকমাস বাদে বাংলা ও ইংরেজি কাগজগুলি তিতু মীরকে গাল পাড়বে। অবশিষ্ট ওয়াহাবী-রক্ত চাইবে। আর ভাড়াটে ঐতিহাসিকরা চেঁচিয়ে যাবে তিতু মীর ছিল ঘোর সাম্প্রদায়িক।

সব আজকের পরে হবে তিতু। বিচারে প্রহসনের পর মাসুমের ফাঁসি হবে। সে নির্ভয়ে এই নারকেলবেড়িয়ায় তার মায়ের চোখে চোখ রেখে হেসে বলবে, মা! মুজাহিদের মা কাঁদে না।—এ কথা বলে সে ভীষণ ঘৃণায় সাহেবকে বলবে, দাও ফাঁসি! দেখ, মুজাহিদ মরতে জানে।

শত শত জন বন্দী হবে, বহুজনের হবে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড! আর তোমার আশৈশব বন্ধু যারা, সেই হাফিজ, হায়দার, বিশু ও আরো ছয়জন ওই ফকিরকে নিয়ে চলে যাবে যশোর, যশোর থেকে ফরিদপুর। যাবার আগে তিন বন্ধু জীবন বিপন্ন করে হায়দারপুরে যাবে। দৌড়ে চলবে তারা, থামবে না। দৌড়তে দৌড়তে তোমার মাকে, মায়মুনাকে ডেকে বলে যাবে, তিতুর জন্যে কেঁদো না তোমরা। তার মরণ নেই। সেই কথাটাই জানাতে চললাম গো আমরা। এক মুজাহিদ আরেক মুজাহিদের মধ্যে বেঁচে থাকে চিরকাল।

আজকের পর সব হবে।

সকলে সকলকে কোলাকুলি করে। তিতু জোরে নিশ্বাস নেয়। মাসুমকে বলে, অঘ্রাণ তো! পাকা ধানের বাস পাচ্ছিস? ধানের গন্ধের মত কোন গন্ধ নাই।

এমন সময় বটগাছের ডগা থেকে হাসিমাদের ছেলেটি হেঁকে ওঠে, ওরা আসছে। সঙিনের ডগায় রোদ ঝলক দিচ্ছে।

সবাই বাঁশের কেল্লার মধ্যে অপেক্ষা করে তিতু বলে, কেল্লার মত কেল্লা হয়েছে বটে। বাঁশ দিয়ে এমন কেল্লা হয় আগে জানিনি।

বিশু বলে, এবার জিতলে এমন কেল্লা শতখানেক বানাব। তবে তিতু একটা দুঃখ থেকে গেল। আমাদের সেই বাঘ পোষাটা হল না। ওঃ, কত আশা করেছিলাম।

হাফিজ বলল, আজ জিতে নিই, বাঘ এনে কেল্লার সামনে বেঁধে দেব, ক'টা বাঘ চাই ?

ওরা হেসে ফেলে সকলেই। তারপর তিতু বলে, আসছে।

স্কট, ম্যাকডোনাল্ড ও সাদারল্যাণ্ড থমকে দাঁড়ায়। এরা সবাই বাঁশের কেল্লার ভেতরে। বাঁশের কেল্লা বটে, কিন্তু তা যে এত বড়, এমন চেহারা, তা ইংরেজরা ভাবেনি।

স্কট বলে, জমিদারগুলো অপদার্থ। তিতুর ডিম সব। কেউ আসেনি, কেউ দেখেনি, আমাদের ভাঁওতা মেরেছে যে কেল্লাটা একটা খেলাঘরের মত।

আলেকজাণ্ডার শুকনো গলায় বলে, শুরু করুন। ওরা কত দূর দুর্ধর্ষ তা বলতে পারি না।

স্কট গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটি তলোয়ারের ডগায় বিঁধিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসে ও জোরে হেঁকে বলে, 'মহাশয়! ভারতবাসীর মহামান্য গভর্ণর জেনারেল আপনাকে সদলবলে গ্রেপ্তার করার জন্য পরোয়ানা দিয়েছেন। আপনি স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হবেন কিনা, জানতে চাই।'

বিশু চাপা গলায় বলে, কথা শুনেছ ? স্বেচ্ছায় কেউ কি গ্রেপ্তার হয় ?

এখন পদাতিক ও অশ্বারোহী ঘিরে ফেলে বাঁশের কেল্লা। ম্যাক-ডোনাল্ডের নির্দেশে কামান এগিয়ে আনা হয় ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসে, ইট ও কাঁচা বেল পড়তে থাকে ধারাবর্ষণে। পদাতিক সৈন্য সে আঘাতে ছড়িয়ে পড়ে, পড়ে যায় তীরবিদ্ধ সওয়ার ও ঘোড়া।

মুজাহিদরা তীর ছোড়ে, ইট ও বেল ছোড়ে এবার গোলা পড়ে কেল্লার ওপর। একটির পর একটি।

আল্লা হো! আল্লা হো! শব্দে নারকেলবেড়িয়ার আকাশ ফাটিয়ে দিয়ে মুজাহিদরা এবার সড়কি, বল্লম, বর্শা ও লাঠি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে।

এবার যুদ্ধ খানিক খোলা মাঠে, খানিক কেল্লায়। তিতু একটির পর একটি ছোট সড়কি তোলে ও স্থির লক্ষ্যে ছোড়ে। খুব শান্ত লাগছে তার, সব বুঝতে পারছে সে। বাঁশের কেল্লাকে রাখা যাবে না, আর সে দেখবে না সূর্যাস্ত। ইছামতির জলে বর্ষার ঢল নামলে আর সে ঝাঁপ দেবে না জলে, এক ডুবে তলার পাঁক তুলবে না গভীর পুকুর থেকে। ক্ষেত থেকে আখ ভেঙে নিয়ে খেতে খেতে আলপথে চলার আশ্চর্য আনন্দ আর জানবে না। হায়দারপুরে আমগাছের গায়ে হেলান দিয়ে মা চেয়ে আছে, তাও আর দেখবে না। বিস্ময়ে দেখবে না মায়মুনার বেদনাহত গভীর কালো চোখ।

কেল্লা হেলে পড়ছে, হেলে পড়ছে। তিতু হেঁকে বলে, বেরিয়ে যা সবাই।

আবারও সে সড়কি তোলে আবারও। তারপর লাঠি তুলে নেয়। লাঠিই তো তার হাতিয়ার ছিল চিরকাল, তিতু মানেই হাতে একটি লাঠি। লাঠিটা চেপে ধরতেই সে আশ্চর্য জোর পায় নতুন করে। আল্লা হো! বলে ভীষণ গর্জনে তিতু লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে ধেয়ে যায়। তিতু মীর লাঠি ধরলে মাছি ঢুকতে পারে না লাঠি পেরিয়ে, তোরা কি করবি?

লাঠি ও বেয়নট, বল্লম ও বন্দুক। চল ভাই সব সৈয়দ আহম্মদের নাম উঠিয়ে চল। হাফিজ রে, তাজুদ্দীন চাচার নাম উঠা। সে-ই তো আমাদের লাঠি ধরতে সেখায়। মাসুম, তোরা সব নারকেল-বেড়িয়ার নাম উঠা। নারকেলবেড়িয়া আজ বালাকোট হতে যাচ্ছে দেখিস না তোরা? মার, মার, দুশমনদের। বাংলার মাটিতে ওরা জমিদার-মহাজন-নীলকুঠি বুনে দিয়েছে, মার, ওদের।

লাঠির জোরে তিতু লাফিয়ে ওঠে ও লাঠি ঘোরায়। তাতেই

ম্যাকডোনাল্ড বুঝেছিল ওই তিতু মীর। ওর গায়ের রং আগুনের মত, কালো চোখে আগুন, প্রতিটি কথায় আগুন। ম্যাকডোনাল্ড ওর দিকে কামানের মুখ ঘুরিয়েছিল। গোলন্দাজ বলতে যায়, ওটা কেল্লা নয়, ও তো একজন মানুষ!—ম্যাকডোনাল্ড গোলন্দাজকে ঠেলে দেয় ও গোলা দাগে। না, বুকে লাগেনি। ডান পা উরু থেকে খসে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তিতু মীর।

মুজাহিদরা ছুটে আসে। কেল্লার দেয়ালে হেলান দিয়ে ওরা বসায় তিতু কে। তিতু বলে, আমার আমার লাঠি?

লাঠিটা ও হাতে ধরে। কে ওর পাশে এসে পড়ে? কোন মুজাহিদ? কে ওকে ডাকছে, তিতু! তিতু। তিতু!

ফকির, আপনি এখন কেন ডাকেন? এখন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হবার সময় নয়। এখন যুদ্ধ চলছে।

তিতু শোন! শোন!

কি শুনবে তিতু? কিছু কি সে শুনতে পাচ্ছে—?

ভাই সব, তিতু মীরের নাম উঠিয়ে চল! ভাই সব, তিতু মীরের নাম উঠিয়ে চল! কে বলছে? ওরা তিতু মীরের নাম উঠাচ্ছে কেন? নারকেলবেড়িয়ার নাম উঠা, পাকা ধানের নাম উঠা, চাষীর মুখের হাসির নাম উঠা, সেই সব মানুষের নাম উঠা যাদের কারণে মুস্বিরৎ শাহ কৃপাণ ধরে, সৈয়দ আহম্মদ বালাকোটের জেহাদের শহীদ হয়, সরিয়তউল্লা বল্লমে শান দেয়। তবু ওরা বলে চলে—তিতু মীর! তিতু মীর! যেন তা মন্ত্র, যেন তা অমৃত, যেন তা জীবন! তিতুর কানে ওই শব্দঝঙ্কার ক্ষীণ হতে হতে, ক্ষীণ হতে হতে, টুপ করে নৈঃশব্দ্য হয়ে যায়।

অনেক, অনেকক্ষণ যায়। নারকেলবেড়িয়া জুড়ে শস্যক্ষেত্র, আলপথ—সর্বত্র গোরা সৈন্যের তাণ্ডব চলে।

বন্দীরা চালান হয়, ফৌজ চলতে থাকে। তিতুর সামনে ও আশপাশে মুজাহিদদের শব। স্কট, সাদারল্যাণ্ড ও ম্যাকডোনাল্ড আলেকজাণ্ডারের দিকে তাকায়।

আলেকজাণ্ডার বলে, তিতু এবং সকল মৃত মুজাহিদকে কেল্লার

ভেতরে নাও। কেল্লা জ্বালিয়ে দাও। খুব ভাল করে চারদিকে আগুন দাও।

—জ্বালিয়ে দেব? তিতু তো মুসলিম।

—জ্বালিয়ে না দিলে তিতু নিঃশেষে শেষ হবে না। ওর মৃতদেহ পেলে মুজাহিদরা আরেকটা বিদ্রোহ শুরু করবে তিতুর লাশ বিপজ্জনক। জ্বালিয়ে দাও।

বাঁশের কেল্লার বাঁশগুলি পাঁজা করতে থাকে সিপাহীরা, তিতুকে জ্বালাবার আয়োজন করতে থাকে। আলেকজাণ্ডার বুঝতে পারে না এটা শেষ, না শুরু, না অবিচ্ছেদ এক কাহিনী। তিতুর দিকে তাকায় সে! তিতুর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি লেগে থাকে অমলিন। হাসিটা আলেকজাণ্ডারকে তার প্রশ্নের উত্তর তাকেই ভাবতে বলে।

১৯শে নভেম্বর, ১৮৩১, নারকেলবেড়িয়া ॥

॥ শেষ ॥